অস্ফুট

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ-ছাত্রাবাসের মুখপত্র-বার্ষিকী

সম্পাদক

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

আব্দুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ

দ্বিতীয় বর্ষ

পৌষ—১৩৩৪ সন।

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেল

রমণা, ঢাকা।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি—অধ্যাপক বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ।

সহঃ সভাপতি—অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর, এম্ এ ; বি এল্ ; বি টি।

সম্পাদক—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

আব্দুল ওয়াহাব মাহ্‌মুদ

সভ্যবৃন্দ

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রীশৈলেশরঞ্জন ঘোষ,
শ্রীরমণীমোহন রায়,
শ্রীমনোরঞ্জন ঘটক,
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায়,

মহম্মদ জামামিঞা মজুমদার,
" আব্দুল আজিম,
সিরাজুল ইস্‌লাম,
মজহরুল হক্।

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

রমণা, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হোষ্টেল হইতে
প্রকাশিত।

আমাদের কথা।

বিগত বৎসর হইতে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ এই ছাত্রাবাসে যে সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের ভিত্তি-পত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষের অস্ফুট বাহির হইল। অতএব বর্ত্তমান সংখ্যায় যদি প্রশংসার্হ কিছু থাকে তবে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠাতৃ-বর্গেরই প্রাপ্য কিন্তু আমাদের অক্ষমতা-প্রযুক্ত ত্রুটী বিচ্যুতির সমালোচনায় আমাদেরই ন্যায্য অধিকার, অন্য কাহারো নহে।

অস্ফুট কুসুমকলিকার আভ্যন্তরিণ পুঞ্জীকৃত সৌরভসম্পদের বহির্বিকাশ একমাত্র প্রস্ফুটনেই সম্ভবে। অতএব ইহা হইতে পূর্ণরসাস্বাদনের আশায় অনেককেই বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। তরুণকণ্ঠের এই অস্ফুটক্ষীণকাকলী বাণীর মন্দিরপ্রবেশের অযোগ্য তাই সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ইহার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ সমীচীন নহে। তথাপি বাণী মণ্ডপের পুণ্যবেদীমূলে অঞ্জলীদানের সকলেরই সমান অধিকার, আমাদের দীন তরুণ পূজারীর অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণ এই নৈবেদ্য নিবেদনে অক্ষম হইলেও আমরা সেই সার্ব্বজনীন অধিকারের দাবী করি।

এতৎসম্পর্কে আমাদের এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতরকার্য্যে যিনি সর্ব্বদা উৎসাহিত করিয়া অপার সাহায্যদান করিয়াছেন সেই পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের বিস্তর ত্রুটী থাকিয়া যায়। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে আমাদের এতৎকর্ম্মের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও নিয়ত উৎসাহদাতা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মৌলবী আনোয়ারুল কাদের সাহেব পদবৃদ্ধি লাভ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন; তবে তিনি যোগ্য উচ্চতর পদলাভ করিয়াছেন ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

পরিশেষে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ মহাশয় যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পরিদর্শন করিয়া দিয়াছেন সেজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

বিষয়-সূচী।

দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ | ১৩৩৪ সন

কালিদাস

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

দিগন্তের চক্ররেখা প্রতিভায় করিয়া প্রকাশ,
যেদিন জন্মিলে কালিদাস!
দ্যুলোকের দিব্যজ্যোতিঃ ব্রহ্মাণ্ডের যশোপ্রভাকর!
উজ্জ্বলিয়া ভারতের ক্ষুদ্রতম গিরির গহ্বর;
ভেদিয়া নিবিড়-কৃষ্ণ আষাঢ়ের পুঞ্জঘনঘটা,
প্রকাশিল পুণ্যপ্রভা ক্ষণমধ্যে অনন্ত শূণ্যটা,
—ত্রিদিবের ইন্দ্রায়ুধচ্ছটা;
প্রাবৃটের ধারাহতা ধরিত্রীর সদ্যস্নাতচ্ছবি,
আনি' দিলে কবি॥

বনানীর শ্যামকান্তি সুষমায় লভিয়া বিকাশ,
তোমারে বরিল কালিদাস!
শিশু-অঙ্গে হেরি' তব ত্রিদিবের প্রদীপ্ত-প্রতিভা,
আস্যভরা অনুপম মনোরম আদিত্যের বিভা,
চিহ্নিত ললাটপ্রান্তে ভবিতব্য বিজয়-নিশান,
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র নিমেষেতে হ'লো অনুমান।
তাই তব প্রাপ্তির সম্মান,
অর্ঘ্যরূপে বিশ্ববাসী পদপ্রান্তে করিছে অর্পণ
অগুরু-চন্দন॥

ভারতের বক্ষে বক্ষে প্রতিকুঞ্জে কি মহা-উল্লাস,
সে' দিন জাগিল কালিদাস!
স্বর্গচ্যুত দেবশিশু দেখাদিলে যবে মর্ত্ত্যপথে,
প্রতিভার ক্ষণ-প্রভা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিল ভারতে;
নিরাশার বক্ষতলে জাগি' উঠি' আশার অঙ্কুর,
নিমেষে বিশাল শাখী পত্রপুষ্পে দৃষ্টি-সুমধুর।
তাই আজি রিক্ত স্বর্গপুর,
মুক্ত হস্তে করি' দান ভারতেরে স্বরগের সুধা,
করিলে বসুধা॥

অতুল ঐশ্বর্য্যরাজী মহামূল্য বৈভব-বিলাস,
সঞ্চিত র'য়েছে কালিদাস!
আজিও মলিনস্মৃতি বক্ষে ধরি' সে মহাভাণ্ডার
তরিয়াছে এতদূর মহাকাল-ধ্বংস-পারাবার।
ভুলে নাই, ভুলিবেনা চন্দ্রসূর্য্য-ব্যোমবিদ্যমানে,
সে' স্বর্গ-বীণার সুর চিরনব প্রকৃতির গানে
কিম্বা ক্ষিপ্ত সিন্ধু-বীচি-তানে
তুলিবে ঝঙ্কার নব চিরদিন অপূর্ব্ব-দ্যোতনা,
ললিত-মূর্চ্ছনা॥

কিন্তুহায়, তব মহাজীবনের কোথা ইতিহাস,
ওহে বিশ্বপূজ্য কালিদাস !
কবে কোন্ মাতৃ-অঙ্ক করি' দিলে দীপ্ত প্রভাবান্
ভাগ্যমতী কোন নারী তব মুখে করি' স্তনদান,
এ'হেন অমূল্য আত্মা যত্নভরে করিলা রক্ষণ ?
গরীয়সী জন্মভূমি কোন্ অংশে করিল ধারণ,
মহামূল্য তব দেহধন,—
নাহি স্মৃতি, নাহি চিহ্ন, নাহি তার তুচ্ছ ইতিহাস,
ওহে কালি-দাস ॥

বিজন বনানীতলে নিজগুণে লভিয়া বিকাশ,
নীরবে ঝরিলে কালিদাস !
কিন্তু সে' পুষ্পের আজো উপভোগ্য সুমন্দ-সৌরভ,
ধরিত্রীর প্রতিখণ্ডে প্রদানিছে মহান্ গৌরব।
প্রস্ফুটিত এ'প্রসূনে আকুলিত কোন্ বনদেশ ?
কোন মর্ত্ত্য-তেপান্তরে পারিজাত লভিল উন্মেষ ?
কেবা জানে তাহার উদ্দেশ,
কোন্ কল্পনার যুগে হেন রত্নে ঘটা'ল বিনাশ,
নাহি ইতিহাস ॥

রন্ধ্রহীন অন্ধকারে জ্ঞানালোর পিঙ্গল-আভাষ,
এনেছিলে তুমি কালিদাস !—
কোন্ গিরি গহ্বরের একপ্রান্তে করিয়া সাধনা,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বজ্ঞান একাকারে করিলে রচনা ?
আগম, পুরাণ, বেদ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান,
এক ক্ষুদ্রজীবনেতে কি প্রকারে করিলে সন্ধান ?
বিশ্বজ্ঞান ভারে গরীয়ান্ !
জ্ঞানের অমূল্য তথ্য ছত্রে ছত্রে করিছ প্রকাশ,
ওহে কালিদাস ॥

কোন্ শান্ত বনানীর ঘনশ্যাম নিকুঞ্জ-বিলাস,
বক্ষে ধরি' তোমা কালিদাস ;—
মধুপ-গুঞ্জন-গীতি, দখিনার সুমন্দ-হিল্লোল,
শ্যামল শৈবালবতী তটিনীর ললিত কল্লোল,
প্রাচীর কনকচ্ছটা, ধারাসিক্ত ধরিত্রী-প্রতিমা,
যুবতীর সৌন্দর্য্য-মহিমা ;
এমন নৈপুণ্যভরে শিক্ষা দিল মহাযত্নপর,
ওহে কবিবর ॥

আষাঢ়ে উত্তর-মেঘে পুঞ্জে পুঞ্জে বিক্ষিপ্ত আকাশ,
দর্শন করিয়া কালিদাস !
নির্ব্বাসিত বিরহীর অন্তরের গভীর বেদনা,
কেমনে লেখনী-মুখে স্পষ্টভাবে করিলে রচনা—
অভাগিনী যক্ষ-জায়া একাকিনী বিরহ-শয্যায়,
কেমনে কাটা'ত নিশি দয়িতের মঙ্গল-চিন্তায় ; —
বিরহীর করুণ ভাষায়,
ব্যাথাভরা দীর্ঘশ্বাসে বেদনার মর্ম্মভেদী স্রোত,
তব মেঘদূত ॥

পুষ্পক-আরোহি' যবে রাঘবেন্দ্র জানকী সকাশ,
বিরলে বসিয়া কালিদাস !
সিন্ধুর স্বরূপ-কথা সবিস্তারে করিলা বর্ণনা ;
কেমনে প্রেরিলে ঊর্দ্ধে হেন স্থানে তোমার কল্পনা !
ফেলিল সিন্ধুর জলে শরতের ছায়াপথে আর,
বিষ্ণুর মহত্ত্বসনে সমুদ্রে করিলে একাকার। —
প্রলয়-প্রবৃদ্ধ-পারাবার
রসাতলোত্থিত-পৃথ্বীর মুহূর্ত্ত বক্ত্র-আবরণ,
করিলে-কল্পন ॥

কোন্ ঘনবনচ্ছায় কুঞ্জগুল্মে আশ্রম-আবাস
নির্ম্মাণ করিয়া কালিদাস,
বাণীর বিজয়বীণা স্বহস্তেতে লয়ে আপনার,
স্বর্গীয় ললিতসুর-মূর্চ্ছনায় তুলিলে ঝঙ্কার!
অনিন্দ্য সে' রাগিনীর স্পন্দহীন প্রবাহ তড়িৎ
জাগা'ল অনন্ত শূন্য প্রকাশিয়া পুণ্যশ্লোকগীত,—
অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিৎ;
আজিও সে' ঝঙ্কারের মধুময় ধ্বনি-প্রতিধ্বনি,
জাগিছে তেমনি॥

কোন্ দূরস্থান হ'তে কিবা চক্ষু করিয়া প্রকাশ,
দর্শন করিলে কালিদাস!
তালীবনরাজী-নীলা সমুদ্রের তন্বীবেলাভূমি-—
—দিগন্তের প্রান্তদেশে শ্রান্তিবশে রহিয়াছে চুমি'—
অয়শ্চক্রনিভ তারে কোন্ চক্ষে করি' নিরীক্ষণ,
ভাতিছে কলঙ্করেখা অম্বুরাশী করিয়া বেষ্টন,
কি প্রকারে করিলে চিন্তন?
কোন্ দিব্যতেজোগুণে কল্পনারে করি' নিলে দাস,
ওহে কালিদাস॥

মধুচোর-গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে কণ্বের আবাস,
তব কল্পনায় কালিদাস!
স্বর্গের নন্দন-বনে তুচ্ছ বলি' পারে গঞ্জিবার,
শ্যামল-নিকুঞ্জচ্ছায় খঞ্জনের চঞ্চলবাহার,
কুঞ্জলতা পুঞ্জে পুঞ্জে আশ্রমের আঙ্গিনার বুকে,
যে মনোরঞ্জন শোভা ধরি'দেয় স'বার সম্মুখে,
কবে কোন্ কল্পনার চোখে,
তাপসের তপোবন হেন চক্ষে করিলে দর্শন,
হে চিত্ত-রঞ্জন॥

যৌবন-মদিরালসা নবীনার সুষমা-বিকাশ,
কেমনে বর্ণিলে কালিদাস !
বৃক্ষের বল্কল-বাস কটিদেশে আবদ্ধ মেখলা,
স্বর্গের সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিপিন-বল্লরী শকুন্তলা।
কোন্ দিব্য চক্ষু নিয়া বক্ষে ধরি' কিবা মহাজ্ঞান,
বিচিত্রিয়া হেন চিত্র লভিয়াছ বিশ্বের সম্মান,
এ'শিল্প সাধনা মহীয়ান্
কোন্ বনানীর কোলে কিবা পুঁথি করি' অধ্যয়ন
করিলে সাধন ॥

জাগিল অন্তরে তব সুগভীর ভকতি উচ্ছ্বাস,
দ্বিজোত্তম ওহে কালিদাস !
নৈপুণ্যে রচিলে যবে শিবাণীর কুমারসম্ভব
শ্রদ্ধার সুরসসিক্ত অনুপম রচনা বৈভব।—
ত্রিমূর্ত্তি মহিমাস্তোত্র পঞ্চমুখে করিলে কীর্ত্তন,
হেরিয়া ভকতি ভাব বৈকুণ্ঠেতে তুষ্ট নারায়ণ।
বিক্রমোর্ব্বশীয়ের কীর্ত্তণ,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডতলে অমরত্ব করেছে অর্পণ,
ওহে চিরন্তন ॥

সাধনার শক্তিবলে লাভকরি' বাণীর আশ্বাস,
উপমায় শ্রেষ্ঠ কালিদাস !
গাহিলে বন্দনাগীতি জননীর স্নেহের সন্তান,
সর্ব্বাগ্রে শিশুর মত মাতৃস্তন্যে করি' দৃষ্টিদান।
কোন্ কুঞ্জ বীথিকার শান্তচ্ছায় করিয়া রচনা,
বাণীর মানস-মূর্ত্তি ভক্তিভরে করিলে অর্চ্চনা ?
কোন্ ক্ষণে বীণার মূর্চ্ছনা,
তব কর্ণে প্রবেশিয়া দিব্যরসে করিল বিভোর,
ওহে কবিবর ॥

কবে কল্পনার যুগে মহর্ষি বাল্মীকি বেদব্যাস,
তোমার অগ্রজ কালিদাস!
রচিলা অমর কাব্য অজ্ঞতার অন্ধকার তলে,
সহস্রশতাব্দী আজ ডুবি'গেছে কালের অতলে,
কিন্তু আজো চিরন্তন মধুময় সে' অমূল্য গীতি,
অব্যয় অক্ষয় হ'য়ে রহিয়াছে পাশরি' বিস্মৃতি
মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের অতিথি,
তেমতি তোমার কাব্য ধরিত্রীর মহামূল্য ধন,
ওহে চিরন্তন ॥

উজ্জয়িনী রাজসভা কোথা তার ঐশ্বর্য্য-বিলাস,
মহারত্ন ওহে কালিদাস!
কোথায় বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সেবিল যে'জন,
বিনাশ করেছে তারে মহাকাল-তর্জ্জনী শাসন,
নাহি তার রাজসভা, নাহি আর জ্ঞানের গরীমা,
বিলুপ্ত বাস্তবচ্ছবি, কিন্তু তার প্রতিভা দীপ্তিমা,
আজো হায়, দিগন্তের সীমা,
সমুজ্জ্বল রশ্মিজালে উদ্ভাসিত করে নিরন্তর,
ওহে কবিবর ॥

আজিও উত্তরমেঘ ঘোররবে ভেদিয়া বাতাস,
পুঞ্জে পুঞ্জে ধায় কালিদাস!
বিন্ধ্যের অত্যুঙ্গ শীর্ষ দলে দলে করিয়া চুম্বন,
আষাঢ়ের কৃষ্ণচ্ছটা-অট্টহাস্যে মুখর গগন
—বিরহী যক্ষের অশ্রু অবিশ্রান্ত করিছে বর্ষণ।—
হৃদয়ের গুপ্তব্যাথা গুমরিয়া করে অনুক্ষণ
নীলিমার অন্তর দহন,
নির্ব্বাসিত-যক্ষস্মৃতি আজো লিপ্ত আষাঢ়ের গায়,
তব বর্ণনায় ॥

প্রতিভানক্ষত্রশূন্য ভারতের গৌরব আকাশ,
জ্ঞানসিন্ধু ওহে কালিদাস !
অস্তাচল অন্তরালে ডুবিয়াছে শ্রান্ত কলেবর,
বিশ্বের মহিমাশশী ব্রহ্মাণ্ডের গৌরব ভাস্কর।
তোমারে লইয়া অঙ্কে যে শশাঙ্কদীপ্তরশ্মিজাল,
নিভেছিল ভারতের ভাগ্যাকাশ করিয়া ভয়াল,
উদিত হয়নি' এতকাল,
প্রাচীর কনককান্তি হ'য়ে আছে পঙ্কিল-মলিন,
আজ বহুদিন ॥

উষার সুবর্ণচ্ছটা গোধূলির রক্তিম আভায,
তোমারে স্মরিয়া কালিদাস ;
আজিও বিমুঞ্চে অশ্রু বিরহিণী প্রভাতে সন্ধ্যায়,
বিজড়িত তবস্মৃতি বনানীর পাতায় পাতায়।—
ধ্বংস হোক, লুপ্ত হোক্ ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড সৃজন,
সিন্ধুর প্রচণ্ডবক্ষে খণ্ডে খণ্ডে তাণ্ডব নর্ত্তন,
কল্পান্তের হোক্ আয়োজন,
প্রলয়-পয়োধিজলে তবু থাক্ তোমার কীর্ত্তন,
হ'য়ে চিরন্তন ॥

লুপ্তপ্রায় অতীতের বেদনায় সিক্ত ইতিহাস,
হে ভক্ত-প্রবর কালিদাস ;
মুছে যাক্ ধুয়ে যাক স্মৃতিপট হতে চিরতরে
বসন্তের সনে বৃক্ষে জীর্ণ পত্র পড়ে' যাক্ ঝরে ;'
নহ বৃদ্ধ তুমি কবি নহ শুধু অতীতের ধন,
অনাগত ভবিষ্যতে করিতেছে আলো বিতরণ,
তবদীপ্ত প্রতিভা কিরণ ;
উজ্জ্বল প্রদীপ্তচ্ছবি চিরনব সাধক সুন্দর,
তুমি কবিবর ॥

প্রাচীন-ভারতে মুদ্রা

শ্রী.......................

প্রাচীন মুদ্রা জাতীয় সভ্যতার লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ সহায়তা করে বলিয়াই পুরাতত্ত্ববিদগণ ইহার আবশ্যকতা পুরামাত্রায় অনুভব করেন। সেজন্য অধুনাবিলুপ্ত ঐতিহাসিক প্রাচীন নগরীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতির মত প্রাচীন মুদ্রাও তদানিন্তন সভ্যতা রীতি নীতি, আর্থিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা নিরূপণ করিবার মাল-মসলা যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করিয়া থাকে। সে জন্য যদিও ভারতীয় সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতার কোন লিখিত ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই তথাপি ভূগর্ভস্থ শিলাখণ্ড কিম্বা মুদা প্রভৃতির অস্তিত্বের নিদর্শন বর্ত্তমানকালে প্রত্যক্ষ করিয়া হিন্দুস্থানের লুপ্ত অতীতগৌরবের ইতিহাস নিরূপণ করা যাইতেছে।

কৌটিল্যের অর্থ নীতিশাস্ত্র কত শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া না গেলেও মনুসংহিতায় "হিরণ্য" "কাহণ" প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে ইহা অনুমান করা হয়ত অসমীচীন হইবে না যে খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ সমাজ-মধ্যে বিনিময় (bartar) দ্বারাই যে জিনিষ পত্রাদির আদান প্রদান করা হইত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি এই বিনিময় প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। সামাজিক সভ্যতার শৈশবকালে যখন মানুষ দলবদ্ধ হইয়া জনপদে বাস করিতে আরম্ভ করে তখনই তাহাদের মধ্যে বাসোপযোগী তৈজসপত্র ও আহার্য্য দ্রব্যাদি সহজ-লভ্য করিবার জন্য এই বিনিময় প্রথা স্বভাবতঃই গড়িয়া উঠিয়াছিল অতঃপর কালক্রমে এই প্রথার অসুবিধা পরিলক্ষিত হইলেই মুদ্রার প্রচলন সমাজ প্রবর্ত্তিত হইল এবং তখন হইতেই এবম্ভূত অসুবিধা সমাজ হইতে দূরীভূত হইল। বিনিময় প্রথা সমাজে খুব অধিক দিন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না; সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অচিরাৎ এই প্রথা পরিত্যক্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে সমাজ মধ্যে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জাগরণের বহু পূর্ব্বেই উদ্ভূত হইয়াছিল। অতএব সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই মুদ্রার উদ্ভব সর্ব্বপ্রথম। যদিও পরবর্ত্তী কালে আলেকজাণ্ডারের ভারতআক্রমনের পর হইতে এতদ্দেশে বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ করিয়াও মুদ্রা নির্ম্মাণ করা হইত তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তিকালে যে ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রার কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই সুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন ছিল, এতদ্ভিন্ন "রজত তাম্র প্রভৃতি ধাতু অতি প্রাচীনকাল হইতে বিনিময়ের স্থায়ী উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে লৌহ সীসক পিত্তল এমন কি টিন পর্য্যন্ত বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে দেখা

গিয়াছে।” ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশেও তৎ সময়ে লৌহ নির্ম্মিত মুদ্রা এমন কি কোনও কোনও দেশে প্রস্তর খণ্ডও মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত। হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরির উপত্যকাদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত সুবর্ণ চূর্ণ (gold-dust) মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত।

“অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীগণ ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনগণের সর্ব্ব-প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। স্বর্ণমুদ্রার নাম সুবর্ণ বা নিষ্ক, রজত মুদ্রার নাম পুরাণ বা ধরণ এবং তাম্র মুদ্রার কার্ষাপণ ছিল।” এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতায় যে “হিরণ্য” প্রমুখ কতিপয় মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় সুবর্ণ মোহরের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হইত। “প্রাচীন ভারতেও প্রথমে চূর্ণধাতু বিনিময়ের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল।” এবং এই চূর্ণ ধাতু ওজন করিবার পদ্ধতি মনুসংহিতায় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। “ভারতবর্ষেও ক্রমে ওজন করা চূর্ণ ধাতুর পরিবর্ত্তে ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। পুরাণ, কার্ষাপণ, সুবর্ণ বা নিষ্ক ক্রমে ওজনের নাম হইতে মুদ্রার নামে পরিণত হইয়াছিল।” মনুর সময়ে চূর্ণ ধাতুর পরিবর্ত্তে ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। এমনকি তৎপূর্ব্ব হইতেও যে মুদ্রার ব্যবহার হিন্দু-স্থানে প্রচলিত ছিল তাহারও আভাস ঋক্ সংহিতায় পাওয়া যায়।

“অর্হন্বিভর্ষিসায়কানিধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপং।”

—ঋক্‌সংহিতা।

এখানে “নিষ্ক নির্ম্মিত কণ্ঠহারের উল্লেখ” দেখা যাইতেছে এবং মনুসংহিতায় স্বর্ণমুদ্রার নাম সুবর্ণ বা নিষ্ক দেখিয়া ইহা অনুমান করা অসমীচীন হইবে না যে বৈদিক যুগেও নিষ্ক অথবা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। ঋক্‌সংহিতায় আরো “দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋষি কক্ষীবন্ সিন্ধুনদতীরবাসী রাজা ভাবযব্যের নিকট হইতে শতনিষ্ক গ্রহণ করিয়াছিলেন।”—[ঋক্‌সংহিতা (প্রাচীন মুদ্রা) ৩।৪।৭৪]

সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, পুরা-তত্ত্ববিদ্‌গণ বৌদ্ধযুগ কিম্বা তৎসমসাময়িক যুগের বহুপ্রকার মুদ্রা খণ্ড মৃত্তিকা তল হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু বৈদিকযুগের সুবর্ণ, নিষ্ক, পল বা হিরণ্য প্রভৃতির বর্ত্তমান অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, কেবলমাত্র প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থাদি হইতে তাহাদের অস্তিত্বের মলিন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগের প্রায় অধিকাংশ প্রচলিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে কতক অজন্তা বৌদ্ধ চৈত্য বা স্তুপস্থিত চিত্রাবলী হইতে এবং কতক অধুনাবিলুপ্ত ঐতিহাসিক নগর প্রভৃতির ভূগর্ত্তস্থ ধ্বংশাবশেষ হইতে। “বুদ্ধ গয়ায় বজ্রাসনের নিম্নে এবং সাকিয়স্তূপে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে” (প্রাচীন মুদ্রা)। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রাচীন মুদ্রা যে চতুষ্কোণ ছিল তাহা ধারণা করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কারণ “সমগ্র ভারতে যে সমস্ত অঙ্কচিহ্নযুক্ত সুবর্ণ রজত বা তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই চতুষ্কোণ।”

দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমনের পর হইতে এতদ্দেশের শিল্প ও শিক্ষা অধিকতর উন্নত হইতে থাকে এবং ইহা হইতেই অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আলেক জাণ্ডারের ভারত বিজয়ের পর হইতেই এতদ্দেশে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয় কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি-হীনতা প্রমাণ করিতে পুরাতত্ত্ববিদগণের অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় নাই। আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বহুসংখ্যক মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বৈয়াকরণ "সিদ্ধান্ত কৌমুদী" প্রণেতা পাণিণি রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের সমসাময়িক, এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বহুপূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার অবস্থিতি সময়েও মুদ্রার প্রচলন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে যে "That Panini knew coined money is plainly borne out by his sutra."

প্রথমতঃ, সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যখণ্ড গোলাকৃতি করিয়া মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত; ধর্ম্মভীরু সমাজ মুদ্রা কৃত্রিম করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সামাজিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইতে থাকে এবং মুদ্রাকে কৃত্রিমতার হস্ত হইতে রক্ষা করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই জন্যই অকৃত্রিম মুদ্রার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের নিমিত্তই তদুপরি চিহ্নাঙ্কন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাচীন ইরানীগণই মুদ্রার উপর চিহ্নাঙ্কনের প্রথা জনসমাজে প্রথম প্রবর্ত্তন করে এবং পরবর্ত্তীকালে প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষ সে রীতির অনুসরণ করে বলিয়া পাশ্চাত্যপুরাতত্ত্ববিদগণ ধারণা করেন কিন্তু এতৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের মতদ্বৈধ আছে, তিনি বলেন "প্রাচীন ভারতবাসী ও ইরাণবাসী, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে একই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র, সুতরাং প্রাচীন হইলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে একই ধাতু ওজনের রীতি ও একই মুদ্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রচলিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই ওজনের রীতি বা মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতি ইরাণবাসী আর্য্যগণের নিজস্ব এবং তাঁহারা ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইবার পূর্ব্ব হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এই কথার যতদিন পর্য্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ধাতুতৌলের রীতি এবং মুদ্রাঙ্কণ পদ্ধতি সম্বন্ধে ইরাণবাসীর নিকটে প্রাচীন ভারতবাসীর ঋণের কথা উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে না।'

কোনও কোনও দেশে বৃক্ষবিশেষের বল্কল খণ্ড এমন কি চামড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হইত কিন্তু ভারতবর্ষে চিরকালই স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর মুদ্রাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। উত্তর কালে ভারতীয় বণিকগণের সমুদ্রবাণিজ্যার্থে বহু দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারাও অন্যান্য অনেক জাতিকেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিল এবং বাণিজ্য করিয়া দেশদেশান্তর হইতে নানাপ্রকার মুদ্রা এ দেশে আমদানী করিয়াছিল সেই জন্যই এতদ্দেশে মুদ্রার এত প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা যে সমস্ত মুদ্রাখণ্ড মৃত্তিকাতল হইতে পুরাতত্ত্ববিদ কর্ত্তৃক উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের সমস্তের উৎপত্তিই ভারতবর্ষে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে না। নৌবিদ্যাবিশারদ ভারতীয় বণিকগণ বিভিন্নদেশ হইতে বাণিজ্য করিয়া বহু প্রকার মুদ্রা এতদ্দেশে আমদানী করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাই কালক্রমে ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে বহির্গত করিয়া প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বলিয়া চালাইয়া দিবার প্রচেষ্টাও যথেষ্ট হইতেছে এমত সন্দেহ করা কোনও প্রকার দোষাবহ হইবে না। কারণ কাল ক্রমে অনেক মুদ্রাপৃষ্ঠস্থ অঙ্কন চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অতএব অতি অল্প সংখ্যক অধুনা প্রাপ্ত মুদ্রাকেই খাঁটী ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা বলিয়া দাবী উত্থাপন করা যাইতে পারে। তবে মোটামুটি প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ে এযাবৎ যত প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে তাহা হইতে ধারণা করা যায় যে পুরাণ ও কার্ষাপণ (সর্ব্ব প্রাচীন মুদ্রা) চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কিন্তু সকলগুলিই চতুঃ সম

কোণবিশিষ্ট ছিল না, প্রথমতঃ তাহাদের গায়ে কোনও প্রকার চিহ্নাঙ্কিত ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে লতাপাতার মত রেখা চিহ্ন দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত চিহ্ন বোধ হয় কোনও অধিকার প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর আদেশে ও অভিপ্রায় মত প্রদান করা হইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধযুগে মুদ্রা নির্ম্মাণের সমস্ত ভার শ্রেষ্ঠী বণিকদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে কতক কাল মুদ্রার আকার সম্বন্ধে স্বাধীনতা চলিয়াছিল কারণ একই সময়ের কতক ত্রিভুজাকৃতি কতক চতুষ্কোণ কতক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং কতক গোলকার মুদ্রা দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যখন ভারতে বিদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ আরম্ভ হইল তখন হইতে সমস্ত মুদ্রাই গোলাকার পরিদৃষ্ট হয়। "খৃষ্টীয় ১৮ শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে ভারতীয় গ্রীকরাজগণের মুদ্রা আবিস্কৃত হয় তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল মুদ্রায় গ্রীক্ ভাষায় লিখিত রাজার নামের পার্শ্বে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে রাজার নাম লিখিত আছে।" বোধ হয় ইহার পর হইতে ভারতবর্ষে আর স্বীয় নিজস্ব মুদ্রার উদ্ভব হয় নাই। সমস্তই অন্যান্য সভ্য সমাজের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

জাতীয় প্রাচীন মুদ্রা লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান সহায়। কালগর্ভনিহিত অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য একমাত্র প্রাচীন মুদ্রার অস্তিত্বের অনুসন্ধান হইতেই সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। দেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র, শাসনতন্ত্র ভৌগলিক জ্ঞান,সামাজিক অবস্থা, পৌরাণিক তথ্য ধর্ম্ম প্রভৃতির লুপ্ত ইতিবৃত্ত সমস্তই একমাত্র প্রাচীন মুদ্রাদ্বারা অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই প্রাচীন মুদ্রাই ভারতবর্ষের লুপ্ত অতীত ইতিহাসের কত অমূল্য তথ্য প্রদান করিয়া ভারতবর্ষের প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই জন্য জাতির ইতিহাসের প্রাচীণ মুদ্রার এত আদর। তবে দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মুদ্রার আনুকূল্যে আমাদের লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে আমরা যতদূর যত্নবান ততোধিক আগ্রহান্বিত বিদেশীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমষ্টি। ভি এ, স্মিথ সাহেবের catalogue of coins in the Indian Museum, কানিংহাম সাহেবের coins of Ancient India অধ্যাপক ভাণ্ডারকার, বুহ্‌লার মেকডোনাল্ড, ক্রিগুল প্রমুখ সুধীবর্গের নানাবিধ মৌলিক তথ্যপূর্ণ গবেষণামুলক ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ রচনা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আনয়ন করিয়াছে।

এই সমস্ত পণ্ডিতবর্গের মুদ্রাতত্ত্বালোচনা হইতে প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক ধর্ম্মের ও স্পষ্ট চিত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনা হইতে জানা যায় যে তাৎকালীন ভারতে "অভিজাত তন্ত্র (Aristocracy), অল্পসংখ্যকব্যক্তিপরিচালিত শাসনতন্ত্র (Oligarchy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) ও প্রচলিত ছিল লোকে শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া শিবমুর্ত্তির পূজা করিত এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু শৈব ছিল। এমত আরো অসংখ্য তথ্য প্রাচীন মুদ্রার সাহায্যে আবিস্কৃত হইয়াছে; যাহার কোনও লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। জগতের আদি সভ্যতার আবাস ভুমি এই ভারতবর্ষের যে বিশাল ইতিহাস আজিও অনন্তবিস্মৃতি-গর্ভনিহিত আছে তাহা পুনরুদ্ধারের পুণ্যপ্রচেষ্টা বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের ঘোরতর দুর্দ্দশার ক্ষণে জাতির আত্মসম্মান পুনর্জাগরণে সহায়তা করিবে।

সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা।

অধ্যাপক কাজী আনোয়ার-উল কাদের এম্, এ ; বি, এল ; বি, টি।

আর্ট এবং কবিতা সম্বন্ধে যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন সৌন্দর্য্য কাকে বলে তার সুন্দর যে বস্তু তার থেকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা নিরূপণের। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত এসব থেকে পাওয়া যায় কিন্তু এসব আলোচনায় সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই উপভোগ করার কোনো সহায়তা করে কিনা ঠিক বলা যায় না। কোনো কবিতার বা কোনো শিল্পের কোন্ টুকু সুন্দর কত সুন্দর তা বুঝতে হলে সেই কবিতা বা শিল্পের মধ্যেই সেটাকে খুঁজতে হবে।

অন্যান্য গুণের ন্যায় সৌন্দর্য্যও আপেক্ষিক অর্থাৎ একটি জিনিষের সৌন্দর্য্য আর একটি জিনিষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কম বা বেশী। তাই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। সৌন্দর্য্য তত্ত্ববিলাশীর উদ্দেশ্য সংজ্ঞা নিরূপণ নয়; যেখানে সৌন্দর্য্যের বিকাশ সেইখানকার সৌন্দর্য্যের ধার বা বিশেষত্ব নিরূপণ করাই তার কাজ।

কোনো কিছুর দোষ গুণ বিচার করতে হলে প্রথমে তার পরিচয় লাভ করা সমালোচকের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দোষ গুণ বিচার করতে হলে যে বস্তুর দোষ গুণ বিচার করা হবে সেই বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিচারকের মনে যে ভাবের উদয় হয় সেই ভাবটাকে ভাল করে বুঝতে বা চিন্‌তে হবে।

গান কবিতা সুচিত্রিত বা সুন্দর জীবনের ভঙ্গিমা এই গুলির সঙ্গেই রুচিতত্বানুসন্ধায়ীর সম্বন্ধ এ গুলি কতকগুলি গুণ বা শক্তির আধার অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের আকর। বিশ্বেশ্বর রচিত প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রই যেমন কতকগুলি শক্তির আধার গায়কের গান, কবির কবিতা প্রভৃতির মধ্যেও সেইরূপ কিছু কিছু গুণ বা শক্তি আছে।

একটি ছবি বা একটি গান কি কোনো পুস্তকে চিত্রিত বা আমার কাছে সুপরিচিত কোনও সুন্দর জীবনের (মানব চরিত্রের) ভঙ্গিমা আমার কাছে কেমন লাগে? আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? আমার জীবনের উপর কি ভাবে কার্য্যকরী হয়? এ সবে আমি কোনো আনন্দ পাই কি না? যদি পাই তবে কতটুকু এবং কি প্রকারের? এই সব তত্ত্বের মীমাংসা সৌন্দর্য্য বিলাসী চান? তা না হলে তাঁদের সৌন্দর্য্য উপভোগ পূর্ণ হয় না। আর্টএর সৃষ্টি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মানব জীবনের উৎকৃষ্ট ভঙ্গিমা এই গুলি সৌন্দর্য্য বিলাসীর কাছে আনন্দের উৎস। যাঁর অনুভূতি যে পরিমাণে প্রখর তিনি সেই পরিমাণে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে সক্ষম। যার সেই অনুভূতির অভাব, কোনো সংজ্ঞা দিয়ে তাকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করার আনন্দ দান অসম্ভব।

ত্যক্ত বৃন্দাবন

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রামের এক বৈঠকে সেবার গ্রামেরই একজন প্রবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হ'য়ে বাবা তাঁ'র সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রেছিলেন এই ব'লে —"কি ম'শায়, মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে যে ?"

বাবার উক্তিতে ভদ্রলোক সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন জানি না। অনেকস্থলেই স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে বাবা এমন আলাপ ক'রে বসেন, যেটিকে আমরা আধুনিক শিষ্টতার মাপ কাঠিতে মেপে, হয়ত অনধিকার চর্চ্চা আখ্যা দেব। কিন্তু তাঁ'র এই উক্তিটির গভীরতা তলিয়ে দেখলে হয় নাকি ?

দেশের কাছে যাঁরা একরকম পর-দেশী, বহুদিন পরে একবার ঘরে ফিরে এলে গৃহবাসকে যাঁ'দের প্র-বাস মনে ক'রতে হয়, তাঁ'দের বাড়ী ফিরে পেলে বাস্তবিকই মনে হয়, "বৃন্দাবনের আজ বড় সৌভাগ্য !"

বাংলার পল্লী আজ ত্যক্ত বৃন্দাবন। পল্লীর বুক আঁকড়ে ধরে রয়েছেন যাঁরা, তাঁ'রাই বৃন্দাবনের রাখাল। তাই যখন মথুরার ঐশ্বর্য্যের ছাপ প'রে কোনও নাগরিক তাঁ'দের মধ্যে ফিরে আসেন, বৃন্দাবনবাসী তখন ভাবেন, আমাদের রাখাল রাজা বুঝি ফিরে এলেন ;" অভিমানে তাই ব'লে উঠেন, "মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে যে ?"

কংসের কত চর এসে বৃন্দাবনবাসীর জীবনকে অহরহঃ আতঙ্কিত ক'রে তুল্‌ছে—কেশী, প্রলম্ব, বক, চানুর চিরকালই এ'সে তাঁ'দের পিষে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। কত ঝঞ্ঝাবাদল এ'সে তাঁ'দের ধূয়ে মুছে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। এরা সব কি আকারে আস্‌ছে ? রোগ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন।

হঠাৎ তাই বহুদিন পরে আপনার জনকে কাছে পেলে বৃন্দাবনের রাখাল উৎফুল্ল হ'য়ে ভাবেন, "এই বুঝি এলেন আমাদের 'কেশী নিসূদন' 'চানুর-বিমর্দ্দন' 'গোবর্দ্ধন-ধারণ'---বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে।"

প্রেমের অভাবজনিত কত দ্রোহবুদ্ধি, কত আত্ম-কলহ, অজ্ঞতাপ্রসূত কত কুপ্রতা, তাঁ'দের জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে তুল্‌ছে। বাহির থেকে তাই ঘরের জন ফিরে এলে বৃন্দাবনবাসী ভরসা পেয়ে ভাবেন, "সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহ মিটিয়ে দেবার জন্যে, সমস্ত আপদবালাই মুছে ফেলে দেবার জন্যে, রাখালরাজা বুঝি আবার ফিরে এলেন !"

পল্লী-বৃন্দাবন আজ শূন্য ; অভিমানী রাখালদের ব্যথিত উদাস দৃষ্টি ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখা যায় না ; পদকর্ত্তা কি পল্লী-বৃন্দাবনের এই নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে তাঁকিয়ে ব্যথা পেয়েই লিখে গিয়েছেন—"গোকুলে উছলল করুণাক রোল, নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল ?"

সমস্ত বাংলার বুক জুড়ে উঠছে শুধু এই 'মাথুর গান'। কীর্ত্তনের বাকী সুরগুলা যেন সব থেমে গেছে, 'পূর্ব্ব-রাগ' 'মান' 'ভাবসম্মিলনে'র ভাবের উৎস যেন আজ শুকিয়ে গেছে ! ভাব সাধনায় আজন্মসিদ্ধ বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর আজ নিস্তব্ধ !

রাখালরাজারা কি একথা ভাবেন না? বৃন্দাবন উজাড় হ'য়ে যাওয়াই কি তাঁ'রা চান? তাঁ'দের পেলে যে বৃন্দাবনবাসী মাথায় ক'রে রাখবে; তাঁ'দের আগমনে বৃন্দাবনের ফুলের ফসল আবার জেকে উঠবে—শূন্য কুঞ্জগুলি আবার গুঞ্জরণ মুখর হ'য়ে উঠবে!

মথুরাবাসী ভাবছেন, ইট পাথরে নির্ম্মিত ঐ পুরীতে, লোকলস্করের মধ্যে তিনি চিরকালই সোয়াস্তিতে থাক্‌বেন। সে ধারণা তাঁর ভুল। ঐ রথ পদাতিক, হয়-হস্তীর কোলাহলে বড় বেশী দিন তাঁর ঠাঁই হ'বে না।

আর মথুরা কি চিরকালই মথুরা থাক্‌বে? একদিন বল্‌তে হ'বে—হয়ত অচিরাৎই বল্‌তে হ'বে—"যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী।"

মথুরাবাসী ভাবছেন, মথুরা না থাকে, যাবেন দ্বারকায়। দ্বারকাও কিন্তু টিক্‌বে না। সে পাষাণপুরী দ্বারকাও একদিন ধ্বংসে যাবেই যাবে—গ্রাস কর্‌বে তা'কে পশ্চিম সাগর। থাক্‌বে শুধু এই বৃন্দাবন—চিরন্তনের বৃন্দাবন—যুগযুগান্তরেও যা'র মহিমা লুপ্ত হ'বে না।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও জাতক

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মফলবাদী বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মা বলিয়া কোনও অবিনশ্বর পদার্থের মানবদেহে অবস্থিতি মূলক বিশেষ ধারণার পরিবর্ত্তে মানবজীবনের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মকেই আত্মার স্থানে আরোপিত করিয়াছে; যতদিন মানব স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা সম্যক্‌ভাব অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ না হয় ততদিন বিভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধরাধামে সকলকেই পুণঃ পুণঃ আগমন করিতে হইবে এবং অতঃ পর পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া কর্ম্মাবসানে

'নির্ব্বাণং পরমং সুখং'

লাভ কবিয়া মরলীলার অবসান করিতে হইবে।

বৌদ্ধ মতে আত্মার পরিবর্ত্তে কর্ম্মকেই অবিনশ্বর ও শাশ্বত বলিয়া ধরা হয়, ব্যক্তিবিশেষের অর্জ্জিত সুকর্ম্ম-সম্পদই তাহার সত্বর নির্ব্বাণ-লাভের সহায়তা করে এবং নির্ব্বাণ লাভই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তাই,

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরমা দুঃখা। (১)

ইত্যাদি দুঃকর্ম্মে ভীতি মূলক উপদেশাবলী তৎকালে লোক মুখে প্রচারিত হইত।

ভগবান্‌ বুদ্ধ সম্যক্‌ভাবে বোধিসত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে বহুবার জীব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন এবং অতঃপর কর্ম্মশুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়া পরিশেষে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হয়েন। জাতকের আখ্যানসমূহ তাহার পূর্ব্বজন্মের এক একটী ইতিবৃত্ত।

---

(১) "গৃধ্নুতা পরম রোগ এবং রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান এই প্রত্যয়জ পদার্থ গুলি পরম দুঃখ।"

তাহা পাঠেই অবগত হওয়া যায় যে ভগবান বুদ্ধ বহুবার বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরিশেষে কর্ম্মবিশুদ্ধি দ্বারা স্বীয় নির্ব্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

জাতকাখ্যান সমূহ বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্যদিগের মধ্যে উপদেশচ্ছলে বর্ণনা করিতেন। পালিসাহিত্যে মোট জাতকের সংখ্যা ৫৫৫, কিন্তু এই সমস্ত আখ্যান সমূহই স্বয়ং বুদ্ধ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত করা সহজ সাধ্য নহে। জাতকের সংখ্যা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতের অনৈক্য আছে. প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মাত্র ৩৪টী জাতকাখ্যান দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিত গণ এতৎ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কাহারো মতে মোট ৩০০ শত কিম্বা ততোধিক মোট আখ্যান দৃষ্ট হয়। ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের অব্যবহিত পর হইতেই জাতক সমূহ তদীয় অনুচর বর্গ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইতে থাকে এবং পরবর্ত্তী কালেও তাৎকালীন পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুকম্পায় আখ্যান সমূহ পরিবর্দ্ধিত হওয়া অসম্ভব নহে, অতএব মূল জাতকের সংখ্যা নিরূপণ সহজ সাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত জাতকখ্যান সমূহ পাঠ করিলে ইহারা সমস্তই এককালে রচিত এমন মনে হয় না। ভগবান বুদ্ধ পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় অতীত জীবনের যাবতীয় ঘটনাসমূহ স্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া নীতিমূলক কাহিনীগুলিই তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতেন। কাহারও মতে তিনি সর্ব্বসমেত ৫৫৫টী অতীত জীবনের কাহিনী শিষ্যদিগকে শুনাইয়াছেন এবং তাহাই সময়ান্তরে জাতকের বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আধুনিক গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় তৎ প্রণীত 'বৌদ্ধ-ভারত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে গৌতমবুদ্ধ মহাবোধিসত্ত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে আরো ৫৫৫ বার জীবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমত উক্তির কোনও ভিত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ ৫৫৫টী স্বীয় অতীত জীবনের কাহিনী উপদেশচ্ছলে শিষ্যগণ মধ্যে বিবৃত করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি ঐ সংখ্যক বারই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এমত সন্দেহের কোনই কারণ নাই। অতএব বোধিসত্ত্ব লাভের জন্য বুদ্ধকে কতবার জীবদেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।

বিনয় অভিধর্ম্ম ও সূত্র সম্বলিত ত্রিপিটকের মধ্যেও কতক সংখ্যক জাতকাখ্যান দৃষ্ট হয়, তাহারা সমস্তই পালিভাষায় রচিত ; কারণ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন যে তদীয় ধর্ম্মমত সমূহ যেন বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য পালিভাষায় রচিত হয়।

ত্রিপিটক বাদ দিলে একমাত্র জাতকাখ্যানাবলীর উপদেশ সমূহ ব্যতীত অন্য কোথায়ও বুদ্ধদেবের স্বকণ্ঠপ্রসূত ধর্ম্ম মত পাওয়া যায় না। এবং এই সকল আখ্যান হইতেই বোঝা যায় যে বৌদ্ধমতে জীবহিংসা, প্রাণীহত্যা, মিথ্যাভাষণ, অসদাচার, বিলাসিতা, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নির্ব্বাণ লাভে পরিপন্থী। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মে আভ্যন্তরিক কিম্বা আনুসঙ্গিক তথ্য প্রভৃতি অবগত হইতে হইলে জাতকের সহায়তাগ্রহণ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। একমাত্র জাতকাখ্যান সমূহ ও ত্রিপিটকই বর্ত্তমান কালে লিখিত স্থায়ী মূল বৌদ্ধমত। জাতকের বৌদ্ধধর্ম্মের সমগ্র স্বরূপ স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মে ইহার এত উচ্চ স্থান। অধিকন্তু ইহাতে তাৎকালীন ভারতীয় সভ্যতা আচারনিষ্ঠা, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক, ভৌগলিক, কিম্বা নৈতিক গার্হস্থ্য জীবনের সম্যক্ ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়াও সভ্যসমাজে ইহার আদর অন্য কোনও প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস হইতেই অল্প নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম মতে জাতিভেদ না থাকিলেও পুরুষ পরম্পরাগত আভিজাত্য গৌরব-জ্ঞান যে উত্তর কালীন বৌদ্ধ ভিক্ষু দিগের মধ্যেও প্রবল ছিল জাতকে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; বৌদ্ধ ধর্ম্মানুসারে এই জাত্যভিমান ভিক্ষু কিম্বা গৃহীদের পক্ষেও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ছিল। এতৎ সম্পর্কে রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ তৎপ্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় লিখিতেছেন "স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়াছিলেন যেমন গঙ্গা যমুনা সরযু অচিরবতী (?) প্রভৃতি মহানদী সমূহ সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয় সেই রূপ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকেনা; তখন তাহারা সকলেই শ্রমণ পদবাচ্য হয়।" ইহা হইতে স্পষ্টতঃই বোঝা যাইতেছে যে তৎকালীন সমাজে জাত্যভিমান কতদূর প্রবল ছিল এবং এমন কি ভগবান বুদ্ধের উক্ত প্রকার নিষেধাজ্ঞার পরও ভীমসেনজাতকে "জেতবন-বিহারের একজন ভিক্ষু আস্পর্দ্ধা করিতেন যে জাতিও গোত্রে কেহই তাহার তুল্যকক্ষ নহে, কেন না তাহার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে।" বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জাত্যভিমান রূপ মহাবিঘ্ন ভারতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। যদিও সামাজিক বিধিব্যবস্থাদির সুবিধার জন্য বৈদিক যুগে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মতে এই প্রথার মূলে বিশেষ বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই সেই সময় হইতে ভারতীয় তথাকথিক সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে থাকে। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং প্রচার করিতেন যে, যে ব্যক্তি যত নীচ জন্মাই হোক না কেন সে নিজ কর্ম্মবলে বর্ণগুরু হইতে পারে।

এদিকে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যও প্রাচীন ভারত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। জ্ঞানচর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হইয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অসিজীবী হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন অধিকন্তু ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ ষোড়শবিধ শিল্পও অস্ত্র বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তক্ষশীলার মত দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতেন। জাতকে এমত বহু আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে ভারতবর্ষ প্রাচ্য জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল, তাহা তক্ষশিলা (১) ও পরবর্ত্তী কালের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় অস্তিত্বের ইতিহাস হইতেই অবগত হওয়া যায়। অতএব ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাক্কালে ভারতে বৈদিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেকাংশে অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, সেই জন্য একটি নূতন ধর্ম্মকে সমগ্র দেশ এত সহসা এমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। অনেকগুলি জাতকাখ্যানের মূলেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের অবনতি প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন, "এদিকে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেক অনাচার দেখা দিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ অসিজীবী হইয়া সৈনাপত্য প্রভৃতি উচ্চ সৈনিক পদ লাভ করিতেন [শরভঙ্গ জাতক]। ইহা তত দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি এপথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অসি লইয়াই জাতক বর্ণিত অনেক ব্রাহ্মণ অটবি-আরক্ষিকের কাজ করিতেন, অর্থাৎ সার্থবাহদিগের দস্যুভয় নিরাকরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কখনো বা নিজেরাই পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও প্রাণান্ত করিতেন। তাহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন; কেহ কেহ বৈশ্যদিগের মত স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতেন; পণ্যভাণ্ড মাথায় লইয়া গ্রামে গ্রামে

(১) ভারতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য ও বৈয়াকরণ পাণিনি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ফিরি করিয়া বেড়াইতেন; বিক্রয়ের জন্য ছাগ ও মেষ পালন করিতেন; সূত্রধারের কাজ করিতেন; অহিতুণ্ডক হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; ব্যাধ-অবলম্বন করিতে ও কুণ্ঠিত হইতেন না; মৃচ্ছকটিকে আমরা একজন চৌরবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাই।"

বৈদিকমতে চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের অত্যল্পকাল পর হইতেই বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ দিগের এ মত দুরবস্থার লজ্জাজনক কাহিনী বৌদ্ধ জাতকাখ্যান হইতে পাওয়া যায়। যদিও পরবর্ত্তীকালে বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধ লেখক কর্ত্তৃক জাতকাখ্যান সমূহ বিশেষ রূপে অতি রঞ্জিত হইয়াছে তথাপি তাহাদের মূলে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মমতে সতত্ সংসারধর্ম্মের অনিত্যতা দর্শন করতঃ গৃহপতিদিগকে গার্হস্থ্য জীবন হইতে বিরত হইয়া বৌদ্ধমঠ বা বিহারে (monastary) সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবনাতিবাহিত করিবার নিমিত্ত প্রচার করা হইত। কিন্তু উপস্থিত কার্য্যক্ষেত্রে (practical field) এই মত প্রতিপালন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্য কতকসংখ্যক ভক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যথাভ্যাসমতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিল এবং অপরাংশ গৃহসংসার ত্যাগ করতঃ বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ লাভ করিয়া 'শ্রমণ' পদবাচ্য হইল। শেষোক্ত ভিক্ষুসম্প্রদায় সংসারী বৌদ্ধগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী ছিল। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের ও প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের পূর্ণাধিকার ছিল। তাহাদের জন্য ভিন্ন বিহার বা মঠের ব্যবস্থা ছিল। ভিক্ষু শ্রমণ দিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইত। সংসারের সহিত সমস্ত বন্ধন না কাটাইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। বৌদ্ধমতেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎসম্পর্কের শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের মুখপত্রে লিখিত হইয়াছে "বংশধর দিগের মধ্যে কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয়, এই বিশ্বাসে মাতা, পিতা ও অন্যান্য অভিবাবকেরা আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং কোন কোন সময়ে উৎসাহ দিয়া বালকদিগকে গৃহত্যাগে প্রবর্ত্তিত করিতেন।' ইহা হইতে বৌদ্ধদিগকে প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ধর্ম্মের অনুকরণকারীও জাত্যভিমানী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও তাৎকালীন বৌদ্ধগণ সামাজিক কুসংস্কারের মোহ কাটাইতে পারে নাই। প্রব্রজ্যাগ্রহণে পুণ্য হয় বলিয়া লোকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সময়ে সময়ে মানত করিত যে তাহারা আরোগ্যলাভ করিলে প্রব্রাজক হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্মমতে নারীজাতিকে নির্ব্বাণলাভের পরিপন্থী বলিয়া বিশেষ ঘৃণা করা হইত। অতএব "রমণীরা অরক্ষণীয়া সাধারণ ভোগ্য. অকৃতজ্ঞতা মোক্ষলাভের অন্তরায় স্বরূপা পুণঃ পুণঃ এইরূপ কটূক্তির প্রয়োগ দেখিয়া আপাততঃ মনে হয় বুদ্ধদেবও তাঁহার শিষ্যগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অতি অবিচার করিয়াছিলেন।" কিন্তু কোনও কোনও জাতকে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধ গণিকাকে স্বীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নির্ব্বাণ লাভে সহায়তা করিয়া দিয়াছেন। যদিও ভগবান মনুর মতে

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

তথাপি চিরদিনই হিন্দুমতে রমণীর মুখদর্শন ব্রহ্মচর্য্য লাভের অন্তরায় বলিয়া উৎকট নিন্দা করা হইয়া থাকে। যদিও বৌদ্ধভিক্ষুণীদিগের জন্য ভিন্ন বিহারের বন্দোবস্ত ছিল তথাপি পরবর্ত্তীকালে ভিক্ষুদিগের মধ্যে নৈতিকচরিত্রের অবনতিহেতু স্ত্রীপুরুষ একই বিহারে বাস করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধ সমাজে ব্যভিচারিণী রমণীর জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান ছিল

(ন্যগ্রোধ মৃগজাতক)। তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইত বর্ত্তমান সময়ের মত তৎকালীন সমাজেও গণিকা ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে প্রাচীন ভারতের নৈতিক সামাজিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় না; যৌবনোদ্গমে নারীদিগের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইত, তবে তাহাদিগের অবস্থাবিশেষে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল। বৌদ্ধ সমাজে কি কি অবস্থায় নারীদিগের ভিন্ন পতি গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল তাহার কতক আভাস বৌদ্ধজাতক ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধগণ জ্ঞানচর্চ্চার অধিকার কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সার্ব্বজনীন শিক্ষার অধিকার দান করিয়াছিলেন।

জাতক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বৌদ্ধগণ অহিংসবাদী হইলেও ভিক্ষালব্ধ মাংসাদি আহার করিতেন, ভগবান বুদ্ধ এ বিষয়ে বলিয়াছেন ভিক্ষাদ্বারা শ্রমণগণ যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাই আহার করিতে পারিবে, ভিক্ষুদিগকে মাংস প্রদান বিষয়ে পশুবধজনিত পাপ দাতার গ্রহিতার নহে।

জাতকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বরূপ যথাযথ জানা যায় এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণের অনুকম্পায়ও বুদ্ধদেবের মতাবলী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ধম্মপদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। পালিসাহিত্যে পদ্যাকারে তথায় বহু মূল্যবান উপদেশাবলী সুললিত ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ লাভই পরম সুখ বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার সম্পর্কে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রকার নীরব রহিয়াছেন, তেমনই স্বর্গের লোভ কিম্বা নরকের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পান নাই; সেই জন্যই সমগ্র জাতক মালা ব্যাপিয়াও ভগবান, স্বর্গ কিম্বা নরক প্রভৃতির নামগন্ধ ও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।
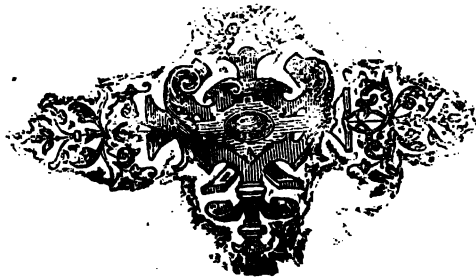
উড়ো চিঠি

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায়

রমণা, ঢাকা।

প্রিয় বিনয়!

য়ুরোপে গিয়াছ অবধি তোমার নিকট হইতে দুইখানা পত্র পাইয়াছি, কিন্তু আমি লিখি লিখি করিয়া তোমাকে এযাবৎ কোন পত্র দিতে পারি নাই। ইচ্ছা হইয়াছিল তজ্জন্য কোন অজুহাত দেখাই। কিন্তু নিরর্থক নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিয়া কোনও ফল নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালীর ন্যায় আমিও আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রযুক্তই সময় মত আমার যাহা করা উচিত ছিল আমি তাহা করি নাই। তুমি হয়ত বলিবে অপরের দোষ দেখাইয়া নিজের দোষ ক্ষালণ করিবার প্রয়াস নিতান্ত যুক্তিহীন ওকালতি বই আর কিছুই নহে। কথাটা ঠিক কিন্তু অযৌক্তিক হইলেও ইহা সত্য. ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। যাউক সে কথ আজ, তোমাকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু এই গল্প উপন্যাসের যুগে আমার সমস্যামূলক বিষয়গুলি আদৌ উপাদেয় হইবে কিনা জানি না। তাই অত্যন্ত অল্প কথায় আমার বক্তব্য শেষ করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের সাহিত্যের কথাই ধরা যাউক। সাহিত্য জাতি সৃষ্টি করে—জাতির পরিচয় দেয়। ইহাই সভ্য ও শিক্ষিত জাতির প্রধান পরিচয়। সাহিত্য নব নব ধারাতে জীবনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া মানুষকে—সরস ও প্রাণবান করিয়া দেতু। সাহিত্য ও মানুষ একে অন্যকে বাদ দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। মানুষের সহিত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় হইতেই দুইটি পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য প্রথম চলিতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পাইতে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের যুগে আসিয়া পড়িল। তাঁহারা ইহাকে নূতন রূপ দিলেন; নূতন পদ্য সাহিত্য গঠন করিলেন—তদানীন্তন সামাজিক সমস্যা ও তাহার কালোচিত সমাধান সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ইহাকে পুষ্ট করিলেন। সাহিত্য সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া নূতনের পথে অগ্রসর হইল।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতি যেমন নূতনের পথে চলিল, সাহিত্যও তেমনি জাতি ও শিক্ষার প্রভাবে সেই পথেই চলিতে লাগিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সাহিত্য পুনরায় নূতন রূপ ধারণ করিল, নূতন সম্পদ আহরণ করিয়া ইহা নূতন ধারায় চলিতে লাগিল। তৎপর আসিল রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্রের যুগ। এই যুগেও সাহিত্য কতক বিষয়ে উন্নতির পথে চলিয়াছে। এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তৎপ্রতিও আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর লেখক স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা সূচনা করিতেছেন এবং তাহা একদিকে নয়, বহুদিকে। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ ভাষা সমস্যা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। এতদিন আমাদের লিখিত ও কথিত ভাষায় প্রভেদ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের চলিত ভাষা সাধু ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ভাষা হইবে উচ্চারণ অনুযায়ী, ইহা আজকাল অনেকের মত। কিন্তু প্রাচীন পন্থিগণ এযাবৎ এই মতে দীক্ষিত হন নাই এবং কখনও হইবেন কিনা তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। এই রকমারী ভাষার প্রচলন হেতু ভাষা সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট কোন ধারা নাই। তুমি হয়ত বলিবে বিচিত্রতাই জীবন। যাউক. সে কথা।

দ্বিতীয়তঃ. বানান সমস্যা—সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতার আর একটী প্রমাণ। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে কয়েকটি শব্দের অবতারণা করিব—"উপন্যাস" এই শব্দটীর বানান কেহ কেহ লিখিতেছেন "য়ুপন্যাস", সেইরূপ 'ইউরোপ', কেহ লিখিতেছেন য়ুরোপ'।—কেহ কেহ 'কোপর' স্থানে লিখিতেছেন "কোপো" স্কুলের স্থানে 'ইস্কুল'। অপর আর এক শ্রেণীর লেখক স্বরবর্ণের ব্যবহার না করিয়া আকার, ইকারের সাহায্যে—ভাব প্রকাশ করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। অর্থাৎ তখন 'আমি' হইবে "াম", 'ইহার' হইবে "িহার" ইত্যাদি।

তৃতীয়ত :—বাস্তবতার নামে বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যে ব্যাভিচারের সৃষ্টি হইতেছে। এক শ্রেণীর লেখক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য গড়িতে প্রয়াসী হইয়া বহু অকথ্য ও অশ্রাব্য বিষয়কে সাহিত্যে স্থান দিতেছেন। "সত্য, শিব, সুন্দর"ই যদি সাহিত্যের চরম আদর্শ হয় তাহা হইলে উক্ত লেখকগণ সেই আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। কেননা যাহা সত্য তাহার অধিকাংশই শিবময় ও সুন্দর নহে।

চতুর্থতঃ, আমাদের সাহিত্যে শব্দ-সম্পদ নিতান্ত অল্প ; কিন্তু পাশ্চাত্য ভাব ধারার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের শব্দ-সম্পদ বর্দ্ধিত করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কেহ ইংরাজী শব্দকে বাঙ্গালা ভাষার পোষাক পরাইয়া বাঙ্গালা শব্দরূপে চালাইতেছেন ; কেহ কেহ ইংরাজী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বাঙ্গালা ধাতুর সহিত তাহার কোন মিল নাই ; আবার কেহ কেহ এরূপ শব্দের সৃষ্টি করিতেছেন যে তাহা ইংরাজী হইতেও অধিকতর দুর্ব্বোধ্য। আমার মনে হয় ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করা আবশ্যক। এই গোলযোগের মূলীভূত কারণ এই যে সাহিত্য জগতের দাদা মহাশয়েরা এখনও এদিকে মনোনিবেশ করিতেছেন না। যদি তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে এত গোলযোগের সৃষ্টি হইত কিনা সন্দেহ।

পঞ্চমতঃ, বঙ্গভাষায় সমস্যামূলক সাহিত্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যুবক যুবতীর কল্পিত ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের অধিকাংশ উপন্যাস ও গল্পের সৃষ্টি হইতেছে। অধিকাংশ লেখকই নায়ক নায়িকা সংগ্রহ করেন সহর হইতে। তজ্জন্য চাই একটি ছাত্রের মেছ্ এবং নিকটে একটী পরিবারওয়ালা বাসা। তথায় একটী সুন্দরী যুবতী থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কৃষক ও শ্রমিকদের গার্হস্থ্য জীবন হইতে নায়ক নায়িকা সংগ্রহ করিবার জন্য এদেশের সাহিত্যিকগণের এখনও দৃষ্টি পড়ে নাই। মনে হয় তাহাদের মনস্তত্ত্ব-বুঝিতে অনেক লেখকই অসমর্থ।

ষষ্ঠতঃ, আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবসাদারী চলিতেছে। অভাবের চাপে পড়িয়া

সাহিত্য অন্নসংস্থানের যন্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। তাই পাঠকগণকে ক্ষণিক আমোদ দান করিয়া যাহাতে দু'পয়সা উপার্জ্জন করা যায় তাহার চেষ্টা চলিতেছে। যে সকল বিষয় অনুশীলন সাপেক্ষ, সেই সকল সমস্যার সমাধান করা কষ্টসাধ্য, অনেকেই তাহা যত্নতঃ পরিবর্জ্জন করিতেছেন। এইজন্যই আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়ক বহির শোচনীয় অভাব। প্রাচীন কালের ন্যায় রাজা মহারাজকে আশ্রয় করিয়া আমাদের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না। তাঁহারা আপন আপন ভোগ বিলাসে লিপ্ত, সাহিত্যের ন্যায় সার্ব্বজনীন ব্যাপারে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি নাই। তাই আমাদের সাহিত্যের এই দুরবস্থা। অনেকে কিছু পুঁজি খাটাইয়া লাভের প্রত্যাশায় ভাঁড়াটিয়া লেখক সংগ্রহ করিতেছেন। সাধারণ শ্রমিকগণের ন্যায় সাহিত্যিক শ্রমিকগণও তাঁহাদের ন্যাজ্য পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত। এদিকে অভাবের তাড়নায় তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন। তাই সাহিত্য চর্চ্চা অপেক্ষা তাহাদিগকে অন্নসংস্থানের চিন্তাই করিতে হয় অনেক বেশী। ফলে কোনরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয় সাহিত্যের জন্য সাহিত্য চর্চ্চা না করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় স্বরূপ সাহিত্য চর্চ্চা করিলে বঙ্গভাষায় উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হইতে অধিক বিলম্ব হইয়া পড়িবে।

সপ্তমতঃ, আমাদের সাহিত্যে দিন দিন সাম্প্রদায়িক ভাবের আধিক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে এই ভাবটী দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যের ন্যায় সুকুমার বস্তুকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ন্যায় পৈশাচিক ভাবের বাহন করিলে সাহিত্যের বনীয়াদি বিনষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আর এক শ্রেণীর লোক দেশও কালের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া "বিশ্ব সাহিত্য" নামে একপ্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে উৎসুক যাহা হইবে সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন। দেশের ভৌগলিক অবস্থান অভাব অভিযোগকে ভিত্তি করিয়া জাতীয় সাহিত্য গড়িবার দিকে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন না।

বাঙ্গালার কবিতাকুঞ্জে আজ বহু কল-বিহঙ্গের সমাগম হইয়াছে কিন্তু,

পিতামাতা পরম গুরু;
কেঁদে হ'লাম কুরু কুরু

বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ কবিতার ও অভাব নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ন্যায় সমালোচক না থাকাতেই উক্ত প্রকার লেখক গণও কবি বলিয়া যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাস গুপ্ত মধ্যে মধ্যে "সাহিত্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার" আবশ্যকতা দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু বিপুল লেখক বাহিনীর সম্মুখে তাঁহাদের ক্ষীণ স্বর যেন অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে। যাউক, আজ এ সম্বন্ধে এখানেই শেষ করিব। ভবিষ্যতে আরো অনেক কথা বলিবার রহিল। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম।

ইতি—তোমারই—বীরেন।

পদ্মবনে

অধ্যাপক হেমচন্দ্র শাস্ত্রী, এম-এ ; বি-টি।

শরৎকাল; তখন ও ঠিক প্রভাত হয় নাই। আমাদের নৌকা একটী বৃহৎ জলাশয়ের ধারদিয়া মরালগমনে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। আমার সহযাত্রীগণ সকলেই সর্ব্বক্লেশাপহারিণী আত্ম সাক্ষাৎকারসুখবিধায়িনী নিদ্রাদেবীর মাতৃস্নেহমাখা অঙ্কে আপনাদিগের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতেছেন। দেবী কেবলমাত্র একজনকে আপনার ক্লান্ত ক্রোড়দেশ হইতে অবতরণ করাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের উপক্রম করিতেছেন, আর সে এক একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মায়ের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে। কথার শব্দে প্রতীয়মান হয় ক্বচিৎ পথ দিয়া যেন দুই একটী লোক যাতায়াত করিতেছে।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে চন্দ্রের সে লাবণ্য আর নাই। তিনি এখন যেন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন, তাই বিশ্রামাগারাভিমুখে গমনোন্মুখ। আকাশ পটে পর্য্যুষিত কুসুম সদৃশ নক্ষত্রমালা ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছে। বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় রাত্রিকালে কিসের জন্য যেন একটা ঘোরতর আয়োজন হইয়াছিল। চন্দ্র এখনও যেন কাহার নিকট হইতে বিদায়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহার অন্তরায় উৎপাদন করিতেছে।

নিম্নে অদূরে তখনও একটা কুসুম যেন কাহার পানে তাকাইয়া আছে। আমাদের নৌকা ক্রমে ক্রমে ঐ কুসুমটীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঝিরা ঐ স্থানেই নৌকা বাঁধিল। ভ্রূক্ষেপ নাই; এক দৃষ্টি। দর্শন সুখলাভ হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়েই হয় ত সে এক নিমিষের জন্যও চক্ষুর পলক ফেলিতেছে না। কিন্তু বিধির বিধান লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই—নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। যাঁহার পানে তাকাইয়াছিল তিনি চলিয়া গেলেন, আর দেখা গেল না। তাই সে মর্ম্মের কথা মর্ম্মে রাখিয়া আপনার ভিতরে আপনি লুকাইল। তাহার মর্ম্ম বেদনা বুঝে এমন কেহ বোধহয় এ সংসারে নাই, তাই সে অভিমানে কাহারও দিকে চাহিল না। প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। ভাবিলাম, এ পৃথিবীতে যে যা চায় সে বুঝি তা পায় না, কেহ কাহারও হয় না। কেহই অপরের দুঃখ বুঝে না, বুঝিতেও চায় না। সকলেই আপন আপন লইয়া ব্যস্ত—স্বার্থের বশীভূত। কিন্তু সে স্বার্থও ত চিরস্থায়ী নহে—ক্ষণিক, অনিত্য। আনন্দের পর নিরানন্দ, দুঃখের পর সুখ, আবার সুখের পর দুঃখ। কিন্তু ক্ষণিক সুখের জন্য আমরা কি না করিয়া থাকি—সহায় সম্পদহীনকেও অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করিনা।

যখন এইরূপ ভাবিতেছি তখন হঠাৎ এক অননুভূতপূর্ব্ব ঝঙ্কার শব্দে আমার মন আকৃষ্ট হইল। চাহিয়া দেখি চতুর্দ্দিকে শৈবালকবরী পরিবেষ্টিতা শত শত কমলিনী বিরাজ করিতেছে।

কোনটি বড়, কোনটী মাঝারি, কোনটী বা ছোট। কোনটী অর্দ্ধ প্রস্ফুটিতা, কোনটী এই কেবলমাত্র ফুটিতেছে, কোনটী বা ফোট ফোট হইয়াছে। সকলেই যেন নর্ত্তকী বেশে সজ্জিতা হইবার অভিলাষে সযত্নে নিজ নিজ সিতাবগুণ্ঠন উদ্‌ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভ্রমরগণ গুণ গুণ গুঞ্জনে গান গাহিতে লাগিল। অমনি প্রভাত বায়ু হিল্লোলে মত্ত হইয়া রাগিণী ধরিল। জল তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তাল দিতে লাগিল। আর পদ্মিনী ফুল আপন আপন সৌরভ বিকীরণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। এই নির্ম্মল প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের আসর বসিয়া গেল। বোধ হয়, ভ্রমর গায়কগণ এই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে এক ঝঙ্কার দিয়াছিল, তাই ঐ ঝঙ্কার শব্দে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। কি অনির্ব্বচনীয় মধুর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ—ইহা বোধ হয় অতল স্পর্শ সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য বিমিশ্রিত, সংসার কলুষ কথা শূন্য শিশুর সরলতা বিলিপ্ত, ও বিষ্ণুপদোদ্ভবা ত্রিমার্গগার পবিত্রাম্বু-প্রাণিত, তাই এত মধুর। চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ; আনন্দ আর ধরেনা; পদ্মিনীর আনন্দ সৌরভে, ভ্রমরের আনন্দ গুঞ্জনে, বায়ুর আনন্দ হিল্লোলে, আর জলের আনন্দ তরঙ্গে—সকলেই আনন্দে নিমগ্ন। সর্ব্বত্রই আনন্দের অভিব্যক্তি। বিভিন্ন, কিন্তু সুর এক। এক সুরে এক মনে কাহার আগমনী বার্ত্তা গীত হইতেছে তাহা জানিবার জন্য আমার অদম্য কৌতূহল জন্মিল। অমনি অনতি দূরে শুভ্র কলহংসমালা কোথা হইতে আবির্ভূত হইল এবং মৃদুমন্দ গতিতে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া রজতনির্ম্মিতস্ফটিকমালিকার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইল। তৎপরে উহারা কোন আসন্ন গুরুতর কার্য্যের ভার বহনের উপযোগী ইহবার জন্যই যেন আপন আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিল ও পুনঃ স্ব স্ব স্থানে সন্নিবেশিত করতঃ গুরু গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। অবিলম্বেই তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ঈষদ্ ভারাবনতবৎ লক্ষিত হইল, বঙ্কিম গ্রীবা আর ও বঙ্কিম হইল, এবং চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। এই মনোহর শোভা সন্দর্শন করিবামাত্রই একটী স্নিগ্ধ সুশীতল বিশ্ববিনোদিনী ছায়া আমার হৃদয়ে পতিত হইল, যেন প্রকৃতি বক্ষে পুরুষের ছায়া পড়িল। অমনি তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয় অব্যক্ত আনন্দে পুলকিত হইল। কাহার ছায়া এত মধুর, কাহার ছায়ায় এত অমৃত নিঃসেক, তিনি কেমন?—এই সকল প্রশ্ন আমার হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, আর আমি উন্মাদের ন্যায় আত্মহারা হইয়া চতুর্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কোন দিক শুভ্রকাশ কুসুমমণ্ডিত, আবার কোন দিক শুভ্র শুভ্র কুসুমগুচ্ছে পুলকিত। চারিদিকেই কেবল শুভ্রের খেলা, পবিত্রতার কোলাকুলি। কোন মূর্ত্তি-ই-ত দেখিনা, তবে কাহার ছায়া আমার হৃদয়কে এত আলোড়িত করিল। একি কোন কুহকিনীর কুহক!—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ দেখিলাম, দিঙ্মণ্ডল শ্বেতবসনে পরিণত হইল, সুনীল গগন আলুলায়িত কেশরাশির শোভা ধারণ করিল, আর অমনি উহার মধ্যস্থলে দীপ্ত সিন্দুর বিন্দু পুঞ্জীভূত হইল। এতক্ষণে বুঝিলাম কাহার ভারবহনে হংসমালার পৃষ্ঠদেশ ঈষদ আনত হইয়াছিল, তাহাদের বঙ্কিম গ্রীবা আরও বঙ্কিম হইয়াছিল, আর তাহারা কাহার সুখস্পর্শে স্বাত্মানন্দ সুখোৎকর্ষে চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিল। এতক্ষণে বুঝিলাম কাহার ছায়া আমার হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল। ইনি যে সেই অমল ধবল বসনা 'তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী শুভ্রকান্তি' আমাদের স্নেহময়ী জননী। মা, তোমার এমন অপরূপ রূপ আর ত কখন দেখি নাই। একবার বাহুপ্রসারণ কর, সেই বীণারঞ্জিত পুস্তক

হস্ত দেখাও। যে হস্ত তোমার অধম সন্তানগণের মঙ্গল সাধনে সতত ব্যগ্র সেই হস্ত একবার প্রসারণ কর। কোথা লুকালে মা. জননী ত সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করেন। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে তাহা মাতৃস্নেহে স্খালিত কর। এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা দেখিলাম, তাঁহার এক হস্ত অপূর্ব্ব বীণা রঞ্জিত, আর এক হস্ত অপূর্ব্ব পুস্তক শোভিত, দেখিয়া নয়ন জুড়াইল। অনবরত বীণার ঝঙ্কার হইতেছে, বিরাম নাই। মেঘের গর্জ্জনে, বিহঙ্গের কূজনে, বায়ুর স্পন্দনে, পত্রের মর্ম্মরে, জীবের কণ্ঠস্বরে ও প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় সেই বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। আবার দেখিলাম পুস্তকের পত্রে পত্রে পঞ্চ মহাভূতের চিত্র সম্বলিত কত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান কলা সাহিত্যের কত বার্ত্তা লিখিত রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আনন্দাশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল; আর কে যেন আমার মস্তক নত করিয়া দিল। আমি মায়ের সেই সুরেন্দ্রমুকুটমণিমরীচিচর্চ্চিতশ্রীচরণকমল লাভের প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করিলাম। কমল মিলিল, অনেকচেষ্টা করিলাম শ্রীচরণ মিলিল না। কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম মায়ের শ্রীচরণ সন্ধান বোধ হয় পাওয়া যায় না, তাই কবিকুলতিলক কালিদাস তাঁহার শ্রীচরণকমলের বর্ণনা করেন নাই। মা, আমরা সন্তান, আমাদের শ্রীচরণ কমলে তত প্রয়োজন নাই; আমরা চাই তোমার করুণা, তোমার মাতৃস্নেহ। 'মা' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই ত প্রথমে মায়ের কান্তির কথা মনে পড়ে, তাই তোমার বরপুত্র কালিদাস প্রথমেই তোমার শুভ্রকান্তির ধ্যান করিলেন। পরক্ষণেই সন্তানের স্তন পানের অভিলাষ হয়, তাই তিনি জ্ঞানদুগ্ধপূর্ণ স্তনযুগল দর্শন করিলেন। আর আমরা কি তোমার সেই দুগ্ধ পান করিতে পারি না? এই বলিয়া যেমন মস্তক উত্তোলন করিলাম অমনি দেখিলাম হংসমালা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মায়ের সে মূর্ত্তি আর আমার সম্মুখে নাই। ভাবিলাম অন্য কোন সন্তানের ক্ষুধার তাড়নার আর্ত্তনাদ মায়ের কর্ণে বোধ হয় প্রবেশ করিয়াছিল তাই তিনি এত অতর্কিত ভাবে অন্তর্ধান করিলেন। তাহার পর দেখিলাম নৌকায় মাঝিরা বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে, আমার সঙ্গিগণ তাহাদের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, আর আমার সম্মুখে একটী সদ্যবৃন্তচ্যুত শ্বেতপদ্ম শোভা পাইতেছে। ঐ পদ্মটীকে মায়ের পাদপদ্ম জ্ঞানে বার বার প্রণাম করিলাম। তখন মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

মুক্তি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়।

নিকষ-কালো আকাশ-তলে
লক্ষ মাণিক জ্বালা,
দেহের খাঁচা টুটে প্রাণ আজ
ঐ খানেতেই পালা।—
যেথায়, লক্ষ মাণিক জ্বালা।
বাঁশ-বনের ওই আঁড়াল দিয়ে,
জোছ্‌না যেথায় নিভ্‌ল গিয়ে
আঁধার ছেড়ে আলোর পথে,
আপন প্রাণে চালা,
যেথায়, নিকষ-কালো আকাশতলে
লক্ষ মাণিক জ্বালা॥

মেঘের কোলে সৌদামিনীর
ক্ষণিক চপল হাসি,
শ্মশাণ ঘাটের অন্ধকারে
জোনাইর আলো-রাশী।
যেথায়, মেঘের চপল হাসি।
মুক্ত হিয়া সেই আঁধারে,
লুকোচুরি খেল্‌বে,—যারে!
অন্ধকারের বন্ধ কোণে
রোস্‌নে পর-বাসী।
মেঘের কোলে সৌদামিনীর
ক্ষণিক চপল হাসি॥

বৈশাখীর ওই ঝঞ্ঝাবায়ে
প্রলয় আয়োজনে,
মরা'র ভয়ে রইবে মরে
কোথায় দেহের কোণে?
ওই, প্রলয় আয়োজনে।
বজ্রালোকের ক্ষণিক জ্যোতিঃ
প্রাণের মাঝে ফেলুক দ্যূতিঃ,
অভ্রলেহী মেঘের কোলে
শিলার গরজনে,
বৈশাখীর ওই ঝঞ্ঝাবায়ে
প্রলয় আয়োজনে॥

বাদ্‌লা-রাতের অশ্রুমুখী
একলা শ্রাবণ রাণী,
কিসের ব্যাথায় অন্তরেতে
পুড়্‌ছে নাহি জানি।
সে যে, একলা শ্রাবণ রাণী।
মুক্ত নবীন তুই বলীয়ান্‌
যা' নিয়ে তোর দীপ্ত পরাণ,
তার আঁখিনীর মুছ্‌তে হ'লে
এই সে আত্মাখানি,
সে যে বাদ্‌লা রাতের অশ্রুমুখী
একলা শ্রাবণ রাণী॥

বেতস বনের ধারে যেথায়
বিজন নদীর তীর,
শুভ্র কেয়াফুলের রাশি,
আঁধারে গম্ভীর।
যেথায়, বিজন নদীর তীর।
সেথায় মুক্ত হাওয়ার সনে,
খেল্‌বে পরাণ আপন মনে,
শিকল-বাধা আঁধার-কোণে,
রইবে না সুস্থির,
বেতস বনের ধারে যেথায়
বিজন নদীর তীর॥

মাংসপেশীর কার্য্য-কারিতা

এ, হাছিব।

ছোট বড় সকল কাজেই এখন আমাদের কল বা engine না হইলে হয় না। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন এই সমস্ত কলকব্জার নাম পর্য্যন্ত ছিল না, তখন কি করিয়া যে অত বড় বড় অট্টালিকাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, মিশরের পিরামিড্ নির্ম্মাণকালেই বা শত শত মণ ভারী পাথরগুলি কি করিয়াই অত উঁচে তোলা হইয়াছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। শুনিতে পাওয়া যায় ঐ পিরামিড্গুলি নির্ম্মাণ করিতে ৪০০০ হাজারের ও অধিক কারিকরের এত বেশী সময় লাগিয়াছিল যে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বর্ত্তমান কালের একজন সুদক্ষ ইনজিনিয়ার মাত্র ৫০ জন কারিগর ও কয়েকটী ইনজিনের সাহায্য লইয়া ঐ সময়ের মধ্যে ঐ রূপ ৫০০ শত পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবেন। অথচ Mechanical efficiency তে আমাদের দেহ রূপ ইনজিনটী অন্যান্য ইনজিনগুলি অপেক্ষা কম নহে। আমরা যদি কয়লা বা coal এর energyকে basis ধরিয়া লই তবে, সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী Diesal Engine এই energyর মাত্র শত করা ৩৭ ভাগ mechanical workএ পরিণত করিতে পারে। অন্যান্য সকল ইনজিন গুলিই এই energy কে mechanical work এ পরিণত করিতে আমাদের দেহের নিকট পরাভূত হইয়াছে।

আবার ইহাও সকলেই স্বীকার করিবেন যে এক একটা পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে কারিগরদের আহারের জন্য যে পরিমাণ শস্য ব্যয় হইয়াছিল উহা যদি একটা ইনজিনের boiler এর নীচে পোড়ান যাইত, তবে ঐ সময়ের মধ্যে ঐরূপ ২০।২৫ টা পিরামিড্ নির্ম্মিত হইয়া যাইত। আমরা জানি energy অবিনশ্বর। ইহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, কেবল এক ধরণের energy আর একধরণে রূপান্তরিত হয় মাত্র। সাধারণ ইনজিন গুলি আমাদের দেহরূপ ইনজিন অপেক্ষা অল্প কার্য্যদক্ষ হইয়াও কিরূপে অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করে?

Portable Engine বা Locomotive এর ন্যায় Noncondensing Engine গুলির efficieney সর্ব্বাপেক্ষা কম; যে ইনজিনগুলিতে বাষ্প জলে পরিণত হইয়া পুনরায় Boiler এ ফিরিয়া আসে, সেই গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং কার্য্য দক্ষ। অথচ এ পর্য্যন্ত যত ইনজিন উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটাতেই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া থাকে!

ইনজিনে যেমন কয়লা দ্বারা তাপ উৎপন্ন করিতে হয়, আমাদের আহার্য্য দ্রব্য দ্বারাও সেইরূপ আমাদের শরীরস্থ তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনজিনে কয়লা না থাকিলে তাপ থাকে না, এবং তাপ না থাকিলে সে ইনজিন হইতেও আর কোন কাজ পাওয়া যায় না; সুতরাং ইনজিনটীর তখন সম্পূর্ণ ছুটী। কিন্তু আমাদের দেহরূপ ইনজিনটীর আর ছুটী নাই, তাহার

কাজের ও বিরাম নাই। তাহার মধ্যে কি রাত্র, কি দিন সর্ব্বদাই কিছু না কিছু তাপ বিদ্যমান থাকেই। আমরা যখন ঘুমাই তখনও আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় মাংসপেশীগুলি (Muscles of respiration) কার্য্য করিতে থাকে এবং heart-Pump ও চলিতে থাকে। সুতরাং তথাকথিত "কাজের সময়" বা working hour এ আমাদের দেহ অন্য সময়াপেক্ষা অল্প মাত্র অধিক কার্য্য করিয়া থাকে, এবং এইরূপ দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা কার্য্য করায় আমাদের দেহ-ইনজিনটী অন্যান্য ইনজিন হইতে অধিক efficient হইয়াও তাহাদের অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের দেহ-ইনজিনটী বেশ কার্য্যদক্ষ বা efficient হইলেও যথেষ্ট শক্তিশালী (Powerfnl) নহে।

steam Engineএ সাধারণতঃ যতই বেশী পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, ইনজিনের efficiency ও ততই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেহ-ইনজিন হইতে বেশী কাজ পাইবার নিমিত্ত আমরা যদি এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করি তবে সে এক ভীষণ ব্যাপার হইয়া পড়ে। দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এমন কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই যাহাতে আমরা আমাদের দেহ-ইনজিনকে ইচ্ছানুরূপ efficient করিয়া লইতে পারি।

আমাদের দেহের Mechanical work, আমাদের মাংসপেশী গুলির দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সমস্ত মাংসপেশী গুলির অবয়ব এবং properties সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার।

আমাদের মাংসপেশী গুলি সাধারণ ও এক ইঞ্চি লম্বা অতি সুক্ষ (এত সুক্ষ যে চোখে দেখা যায় না) fibre বা তন্ত্রী দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক fibre ই উত্তেজিত বা stimulated হইলে একরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সমস্ত fibre গুলির মিলিত সঞ্চালনের ফলই হইতেছে মাংসপেশীর শক্তি বা force. এই তন্ত্রী গুলির গঠন সাধারণতঃ কতকটা লম্বা ব্যাগের ন্যায়; ইহাদের প্রত্যেকটার মধ্যে জেলীর ন্যায় পিচ্ছিল একরূপ পদার্থ আছে। উত্তেজিত হইলে ইহারা যদিও সঙ্কুচিত হয় তথাপি ইহাদের Volume বা আয়তন একটুও হ্রাস পায় না। দৈর্ঘে কমিয়া যায় বটে কিন্তু পাশে ফুলিয়া কতকটা গোলাকার হইয়া পড়ে।

মাংসপেশী উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হওয়া সত্বেও যে ইহার আয়তন হ্রাস পায় না তাহা নিম্নের Experiment এ বেশ বুঝা যায়ঃ—

একটী বোতলের মধ্যে একখানা মাংসপেশী (একটী ভেকের পা লইলেও চলিতে পারে) লইয়া উহার মুখটী খুব মজবুত রাবারের ছিপি দ্বারা আট্‌কাইয়া দিন। ঐ ছিপিটীর মাঝখানে একটী ছিদ্র করিয়া একটী সরু কাঁচের নল প্রবেশ করাইয়া দিন। ছিপির দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছিদ্র করিয়া, উহার মধ্য দিয়া ২টী তার মাংসপেশীর সহিত সংজোযিত করিয়া দিন। পরে মোমদ্বারা ঐ ছিদ্র গুলি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিন। সমস্ত বোতলটা এবং নলের কতকটা পর্য্যন্ত জল ভরিয়া নলের মধ্যে জলের level টা এক টুকরা কাগজ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখুন। এখন পূর্ব্বোক্ত তার ২টী যদি কোন Battery র positive এবং Negative pole এর সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় তবে বিদ্যুত সংস্পর্শে মাংসপেশীটী সঙ্কুচিত হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিবে বটে কিন্তু কাচের নলের মধ্যস্থ জলের level একই স্থানে থাকিবে। সুতরাং মাংসপেশীটির আয়তনের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবেনা।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহারা কেমন করিয়া এইরূপ সঙ্কুচিত হয়। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল surface tension (১) এর পরিবর্ত্তন হেতু এইরূপ সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু কি করিয়া যে এই পরিবর্ত্তন হয় সে সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইতে পারিতেছিলেন না। আমাদের মাংসপেশী যখনই কোন কাজ করে, ইহার তন্ত্রী গুলির ভিতরের Contents গুলির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বা chemical change ঘটিয়া থাকে, ইহা অনেকেই জানেন। বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন "সম্ভবতঃ শিথিল বা relaxed তন্ত্রী গুলির ভিতরস্থ solution টীর surface tension খুব কম। পরে স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় হয়তো এমন একটী solution প্রস্তুত হয় যাহার surface tension অপেক্ষাকৃত বেশী। সুতরাং chemical reaction এর জন্যই surface tension এর ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।" যদিও ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র, তথাপি ইহাতেই তাঁহাদের অনেকে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুমানের মূলে সম্প্রতি কুঠারাঘাত পড়িয়াছে; জানা গিয়াছে—রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হেতু surface tension এ তারতম্য ঘটে না, ইহার অন্য কারণ আছে।—

অনেক সময় medical battery র হাতলের উপর হাত দিলে, হাতের মাংস পেশী গুলি বিদ্যুতের সংস্পর্শে এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে হাতলের উপর হইতে হাত ছাড়াইয়া আনা কষ্টকর হইয়া পড়ে। Laboratory Experiment এর জন্যও অনেক সময় বিদ্যুত দ্বারা উত্তেজিত হইলে কিছু তাপ এবং কিছু বিদ্যুত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিদ্যুতই, Faraday র আবিষ্কারানুসারে, muscle বা মাংস পেশীর fibre গুলির ভিতরস্থ solution টীর surface tension এ তারতম্য ঘটাইয়া থাকে এবং সেই হেতুই fibre গুলি ঐ রূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। পুনরায় যখন বিদ্যুত নিঃশেষ হইয়া যায়, fibre গুলিও শিথিল হইয়া পড়ে।

---

(১) একখানা টেবিলের উপর এক ফোটা জল ফেলিলে উহা সাধারণতঃ গোলাকৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু বেশী পরিমাণে ফেলিলে আর সেরূপ হয় না, টেবিলের উপর তখন জল ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেক তরল পদার্থই যেন একখানা গোলাকার, খুব পাতলা সুক্ষ elastic পরদা দ্বারা আবদ্ধ আছে। এই পর্দার যে চাপ বা tension তাহাকেই surface কহে। যখন liquid এর পরিমান খুব অল্প থাকে, তখন এই surface tension এর জন্যই উহা গোলাকৃতি ধারণ করে কিন্তু পরিমান যখন বেশী হইয়া যায় তখন আর এই surface tension উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেনা, চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া পরে। পারদ বা Mercury র surface tension খুব বেশী তাই, উহা প্রায় সর্ব্বদাই গোলাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে।

মোহভঙ্গ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়।

১

"ঠাকুর মশাই"

"কে রে ?"

—সবে মাত্র রামশরণ তর্কশিরোমণি মহাশয় প্রাতঃকালীন আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া বাটী হইতে নিস্ক্রান্ত হইতেছিলেন ; হঠাৎ ডাক শুনিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন মধু মুচী সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকাল বেলা অস্পৃশ্যলোক দর্শনে যাত্রা অশুভ বলিয়া শিরোমণি মহাশয় নাসিকাগ্র সিট্‌কাইয়া বলিলেন, কেনরে এত সকালবেলা কিসের দরকার ? জানিস্‌নে সকালবেলা বামুন ঠাকুরদের আহ্নিকাদি কর্ত্তে হয় সেই সময় আস্‌লে তাদের তা অশুভ হ'য়ে যায়। সব গেল তোদের জালায় যে একটু সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ব্ব, তা ও হবারটীর যো নাই। "ঠাকুর মশাই"—বামুন ঠাকুরের কোপিত নেত্র দর্শনে মধুর আত্মারাম ভয়ের চরম সীমায় আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দর্ দর্ ধারে অশ্রু বর্ষনে তাহার গণ্ডদেশ সিক্ত দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে ?" বহুদিনের পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ছিন্ন অঞ্চলখানি দিয়া কোন মতে অশ্রু মোচন করিয়া মধু বলিল "ঠাকুর মশাই, মুচি মেথর কি এতই নীচ যে তাদের পূজা কর্ল্লে সমাজে আট্‌কাবে ? এই বছরের প্রথম দিনটায় দেবতার পূজা কর্ত্তে চেয়েছিলুম কিন্তু কেহই কর্ত্তে রাজী হলো না তাই নিরাশবেদনাক্ষুব্ধ ব্যগ্র হৃদয়ে আপনার পানে তাকিয়ে এসেছি"

"—তাইত তুই জাতিতে মুচি, একেত অস্পৃশ্য তাতে আবার তোর পূজা তা—"

"তা কি ঠাকুর ? আপনার পায়ে আমার মাথা খুঁটছি এ পূজাটী করে দিতেই হবে"

এই বলিয়া মধু তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পরিল।

"ছি ছি করিস্ কি !" ঠাকুর মশাই পা সরাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু মধু আর ছাড়ে না দেখিয়া ঠাকুর মশাইকে অগত্যা বলিতে হইল "আচ্ছা পূজা কর্ব্ব কিন্তু কাউকেও জানাবি না"।

"আচ্ছা তাই হোক। পূজার ভেতর আমার নাম প্রকাশ আদৌ অভিপ্রেত নয়। আমি চাই নীরবে তার চরণে একটী কমল দিয়ে সত্বাকে উপলব্ধি কর্ত্তে"।

মধু এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ডাকে তাকে আবার ফিরিতে হইল।

শিরোমণি বলিলেন "আরে দক্ষিণা না দিলে যে পূজাই গ্রহণ হয় না। দক্ষিণা কই ?"

"তাই তো আচ্ছা ধরুণ এই দুই টাকা, আমি গরীব মানুষ জানেনই তো আপনাদের পায়ের তলায় পরেই ত আছি।"

"তা হলে আর হলো না এ সব কাজে কি আর টাকা পয়সার দিকে চাইলে চলে ?"

"সে কি ঠাকুর পূজা কর্ব্বেন না ? এই নিন্ ৩৲ টাকা দিচ্ছি।৹ সাত দিন না খেয়ে থাকতে হবে"।

শিরোমণি মহাশয় এবার কোনও আপত্তি না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পরিলেন।

২

আসিবার সময় মধুর মনের মধ্যে কতগুলো এলোমেলো চিন্তা জমাট্ বাধিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার অন্তর হইতে একটা ক্রন্দনের আবেগ চাপা পরিয়া যেন প্রবলভাবে উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল মুচি মেথর কি মানুষ না? তারা কি ভগবানের সৃষ্ট জীব নয়? তবে কেন তাদের এত অবহেলা, এত লাঞ্ছনা? সারাদিন কেন তাদের এই অস্পৃশ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে? মুক্ত বাতাসের স্নিগ্ধ সমীরণ কি তাদের কল্পনা বিরুদ্ধ? হায় মোহান্ধ মানব, উচ্চকুলে জন্মগ্রহন করিয়া ভগবানের দেওয়া এই পবিত্র ভ্রাতৃ-বন্ধন এড়াইতে চাও?—পারিবে না। যদিও ইহলোকে কতকটা পাশরিয়া থাকতে পার, পরলোকে পারিবে না। মুচীর সংস্পর্শে তোমার জাতির শ্রেষ্ঠতা লাঘব হয়, তাই ছুঁৎমার্গ ধরে চিরকাল চলে এসে সংস্কারের ভিতর দাঁড়িয়েছে। এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে সমাজবিদ্রোহী হৃদয় নিয়া সে তার ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরিয়া আসিল। পরে স্নানাদি সমাপন করিয়া নদী তীরের দিকে গেল—গিয়া দেখিল তার হোম যজ্ঞের ধূয়া ঢেউ এর সাথে মিশে অনন্তের পানে ছুটছে। সে আনন্দের উচ্ছ্সে এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে লাগিল।—এমন সময় হঠাৎ দেখিল ঠাকুর মশাই ছুটিয়া আসিতেছে। ভয় বিহ্বল নয়নে থতমত খাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে মধু জিজ্ঞাসা করিল "কি ঠাকুর, দেবতা আমার পূজা গ্রহণ কল্লে না? হায়! দেবতাও আমার প্রতি বিরূপ"!

এই বলিয়া মধু কাঁদিয়া ফেলিল। শিরোমণি মহাশয় অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন "মধু আয় বাছা, তুই আমার কোলে আয়! তুইই ধন্য আমরা শুধু বৃথা উপবীতের বড়াই করে টিকী নেড়ে বেড়াই। আজ আমার সব মোহ ভেঙ্গে গেছে।"

"কি হয়েছে ঠাকুর?"

"কি হয়েছে জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্? শুন্ যখন আমি বল্লাম "মা, এই মধুর পূজা গ্রহন কর্" অম্নি নদী বক্ষ হইতে ব্যগ্র দুহাত কে জানি বাড়িয়ে দিলে আর উষ্ণ হাওয়ায় ভেসে এসে তার কোপরাগ মিশ্রিত দৃষ্টিপাত আমার হৃদ্‌মন্দিরের অহঙ্কার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে গেল। মধু—আজ হতে তুই আমার গুরু দে দে ওই চরণের পুণ্য ধূলির একটী রেণু আমার মাথায় দে"।

ঠাকুর মধুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পরিল। মধু জোড় হাতে তাকে উঠাইয়া বলিল "ছিঃ একি করেন ঠাকুর? আসুন এ পবিত্র দিনে ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন করি। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাইকে ধর্ম্মে ন্যায্য অধিকার দিন—সকলের ভগবানকে নিজের একের মধ্যে সীমা বদ্ধ করে রাখবার প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে তার মহিমা সকলের কাছে গেয়ে বেড়ান, বলুন—চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম যা কিছু ভগবানের চোখে সুন্দর ঠেকে মানুষের মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত্য হয়েছে সেই সবাই আমার ভাই যতই হোক না সে নগন্য, যতই থাকুক না পরে সে সমাজের নিম্নতম স্তরে"।

মোহভঙ্গ ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক রহিল—শুধু অশ্রুতে মনের কালিমা ধুইয়া নিল।

জোড়বলি

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

শরৎশশীর ঝাপ্‌সা কিরণ হাল্‌কা মেঘের ফাঁকে,—
ঝাঁকে ঝাঁকে
শিশির জলে ভিজিয়ে-দেওয়া নবীনকিশলয়ে
উজল-আভায় ঝলসে দিয়ে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
আছাড় খেয়ে ধরার বুকে পড়ছিলো আজ সাঁঝের আকাশ হ'তে
বিজন পল্লীপথে।
চিন্তা বোঝাই অন্তরে তাই মুক্ত বাতায়নে
ভাব্‌ছে বসে মৈত্র-মশায় বদ্ধগৃহে একলা আঁধার কোণে,—
—"কেমন করে কি করা যায় চতুর্দ্দিকে বিপদ আসে ঝোঁকে,
চিন্তাতে তাই বিকল অঙ্গ শব্দ নাহি জুটায় স্তব্ধ মুখে;
আগমনীর বোধন ষষ্ঠী হ'বার,
দিন দু'তিন মাত্র বাকী আর,—
এ উৎসবে হাজার টাকা ব্যয়
না করলেই নয়;
অথচ আজ ছ'দিন হ'লো গত
খোকা কেবল ভুগ্‌ছে অবিরত,—
জ্বরের পরে নিউমোনিয়া হরেক রকম কত উপসর্গ,
কে জানে তার বিন্দু বা বিসর্গ।
সারা বছর কল্‌কাতাতে,
পশুর মত খাট্‌নী খেটে আজ এসেছি সুদূর পল্লীগাঁ'তে
কয়েকটা দিন কাটবে সুখে বলে,
কিন্তু ভাগ্য মন্দ হ'লে—
দুর্ব্বাবনেও বাঘের মুখে অনেক জনায় পড়্‌তে শুনে থাকি,
তিরিশ দিনের সুখটুকু মোর তাই বিধাতার সহ্যি হলো নাকি?

চিকিৎসকের নিত্যি আনাগোনায়,
পূজোর বাড়ী মুখর হ'লো হায় ;
সহর হ'তে আয়ুর্ব্বেদের শীর্ষচূড়ামণি
কড়ায় গণ্ডায় গুণে নেছে পরশু রজনী—
চারটে শত টাকা !
আজকে আমার আয়ুর্ব্বেদে ভক্তি হলো ফাঁকা
দু'দিন গেলে পর,
একরত্তির ফল হলোনা, হায় পরমেশ্বর !
তাই আজিকে সহর হতে করিয়ে দিয়ে তার
আরো চারশ' খরচ করে এনেছিলেম পুরাণো ডাক্তার !
ধনের মায়া, তুচ্ছ সে ত ; পুত্র সে যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়
পিতার এযে নিত্য করণীয়।
শেষ বয়সের একটু আশা একটা ছেলের প্রাণ,
সবার কাছে পরম মূল্যবান !
সব ধনে তাই তুচ্ছ আজি আত্মসুখও সকল জলাঞ্জলী
মুকুলেতে ঝর্‌বে তবু এমন আশার কলি ?"
ভাব্‌তে এসব ব্যথার বোঝা দ্বিগুণ হলো ভারী,
তাইত তাড়াতাড়ি,
তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে কোচার খুটে মুছ্‌লে আঁখির পাতা,
বল্‌লে মনে,—"হায় বিধাতা !
কোন জনমের কর্ম্মফলে,
দহন জ্বালায় প্রাণের মাঝে এমন ভাবে মর্‌ছি জ্বলে ;
কোন জনমের কোন সে অপরাধ,
আগমনীর প্রাক্কালেতে সাধ্‌লে আজি এমন সাধে বাদ।"
বল্লে শেষে যুক্ত করে স্পর্শ করে মাথা,—
"এমন কঠোর বিপদ হ'তে তুমি আমায় রক্ষে করো ধাতা !"

ঘোমের ঘোরে ঝিমিয়ে-পড়া অবশঅঙ্গ নিয়ে,
ডুব্‌ল গিয়ে আধখানি চাঁদ বাঁশবনের ওই নিবিড় আঁড়াল দিয়ে,

পল্লীপথে নিভ্‌ল চাঁদের শিখা,
ধরার বুকে নাম্‌ল নিবিড় আঁধার যবনিকা।
জান্‌লা পথে নিকষকালো অন্ধকারের দিকে
শূন্য উদাস করুণ দৃষ্টিটিকে
বদ্ধকরে অন্যমনে বৃদ্ধ পিতা রইল কতক্ষণ,
হৃদ্‌কোণে কোন ভাস্‌ল যেন ভবিষ্যতের ভীষণ দুর্ঘটন।
অন্ধকারের আকাশ তলে মেঘের বুকে সৌদামিনী হাসি,
বেতস বনে জোনাইপোকার ক্ষণিক আলোরাশি—
এক হয়ে তার অন্তরেতে
পশ্‌ল হ'য়ে ভীষণতর বীভৎসতার চিত্র অঙ্কনেতে।
দেখলে পিতা বিদ্যুতেরি চপল হাসির সনে
অন্ধকারে রহি অদর্শনে,
নিয়তি তায় কর্‌ছে পরিহাস,
শিউরে উঠে ছাড়লে পিতা ব্যথায় ভরা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
জমাট বাঁধা বাইরের আঁধাররাশি
রূপ ধরেছে এবার সর্ব্বগ্রাসী।
ভাবলে পিতা, "তুমিই হ'রি এ বিপদে কেবল অভয় দাতা।
শ্রান্তিবশে মুদ্‌লে শেষে অশ্রু-ভেজা করুণ আঁখির পাতা।
পশ্‌লে মাতা ঘরের মাঝে চোখ মুছি অঞ্চলে
বসি' স্বামীর পা দুখানির তলে,
বল্লে বিনয়ভরে,—
"সবায় দেখ বলছে সঠিক করে,
খোকা মোদের এবার প্রাণে বাঁচে,
ছাগ যদিগো মানত কর একটী মায়ের কাছে!
বছর বছর করছ পূজা,
শক্তিরূপা চণ্ডী দশভূজা
একবারোত মায়ের নামে একটী পশু করলে নাকো দান,
একটী পাঁটা মানত করে বাঁচাও তোমার একটা ছেলের প্রাণ
টোটকা টাটকা আয়ুর্ব্বেদী হেকিমী ডাক্তারী,
কমত নাহি হলো কোনোটারি!

শেষচিকিৎসা করতে কি দোষ আছে,
দেখ, যদি একটা ছেলে এবার প্রাণে বাঁচে।"
বল্‌তে মায়ের কাঁপল আঁখি ভিজ্‌ল গলার সুর,
কোন্ অজানা বিপদ বায়ে নড়্‌ল পরাণ ব্যথায় ভরপূর।
নয়ন খুলে বল্লে পিতা—দীপ্ত আঁখির তারা,
"যা' হবার নয় তা' নিয়ে কেন কর্‌ছ নাড়াচাড়া ?
চৌদ্দ পুরুষ ধরে,
কুম্‌ড়ো-বলি দিয়ে সবাই আস্‌ছি পূজো করে ;
মাছ-মাংসেরে কেউ কোন দিন কভু,
প্রাণান্তেও তবু
বংশে মোদের স্পর্শ করে নি'ত ?
চিরদিনের এ'সংস্কারে এক নিমেষে কোর্‌ব পদানত ?
কখ্‌খনো নয়,
এমন কথা আমার যেন শুন্‌তে নাহি হয়।"
বল্লে মাতা,—"একটা ছেলে তার পানে কি চাইবে নাকো তবে ?
তোমার, সংস্কারেরেই ভাব্‌লে বড়ো ভবে ?"
মা'য়ের করুণ অশ্রু ঠেলে চল্লো বাপের মন,
নত মুখে রহি' কতক্ষণ
সোজা ভাবে বল্লে পরে,—"একটী পরাণ নাশি'
আরেক পরাণ বাঁচালে বা ই লাভ হ'লোকি বেশী ?
ওই যে মুক অবোধ জীবের প্রাণ
তোমার কোলের খোকার চেয়ে কম্ কিসে বা হ'লো মূল্যবান ?
একটী অবোঝ পশুর পরাণ তরে,
মোর শিশুরে দুর্গা যদি গ্রাসেন রোষভরে,
তাই তবে হোক পূরোক তবে তারি আকিঞ্চণ
দেবতারে ঘুষ দিয়ে মোর ও'ছার প্রাণে নাইকো প্রয়োজন।"
ক্ষুব্ধ মাতা বল্লে,—"কিবা ইচ্ছা বিধাতার
একটা, ছাগের প্রাণে শিশুর প্রাণে কর্‌লে একাকার।
তোমার এ' চিরদিনের সৃষ্টি-ছাড়া ভাব,
সব ব্যাপারেই খামখেয়ালী বিশ্রী অসদ্ভাব।"

ক্রুদ্ধ পিতা বল্লে,—"থামো, ঝগ্‌ড়া তোমার রাখো,
আমার বাড়ী ও'সব আমি ঘট্‌তে দেব নাকো !"

ওষুধ বিষুধ যাচ্ছে বা কোন্ ভস্মস্তূপের তলে,
কোন্ নিদারুণ বিধির কৃপাবলে—
চল্লো ব্যামো বেড়ে,
পিতামাতার গভীর ব্যথা অশ্রু হ'য়ে ঝরে—
নিদ্রাবিহীন নয়ন হ'তে
দুর্ব্বিষহ এমনজ্বালা শেষ জীবনের পথে।
সে'দিন গভীর রাতে,
স্তব্ধ মাতা পিতা আসীন মরণ-মুখো ছেলের বিছানাতে।
দূর গগনের আধখানি চাঁদ কখন,
আকাশ কোণে শরণ মাগি' হয়েছে নিমগন।
আগুণ জ্বেলে শিশুর মাতা মেঝের পরে,
দিচ্ছিল সেঁক খোকার বুকে নিজের আঁচল তপ্তকরে।
কাহার মুখে নাইকো কোন বাণী
গৃহের যত প্রাণী।
বৈদ্যী এসে নাড়ী ধরে ইংরিজিতে বল্লে বাপের কাছে,—
"রোগীর প্রাণের নাই কোনো ভয়, আজকে যদি বাঁচে।"
অবোধ মাতা স্বামীর মুখ পানে,
চাইতে মাত্র বুঝলে সবি আপন প্রাণে প্রাণে।
স্বামীর চরণ ধরি'
আকুল-কণ্ঠে বল্লে রোদন করি'—
"আর কত কাল অমন ভাবে আমায় দেবে ফাঁকি ?
দশটী মাস আপন পেটে রাখি'
করনু গঠন দেহ কত বইনু বোঝার ভার,
আজকে হোলো তার প্রাণে হায় তোমার শুধু একাই অধিকার?
বল্‌ছি আমি, এখনো গো, মানত কর মায়ের কাছে,
একটী পশু ; ছেলে যদি বাঁচে !
স্বপ্নে আমি দেখেছি মা একটী পশু পেলে,

ফিরিয়ে দেবেন ভগবতী মোদের কোলের ছেলে ;
ছেলের লাগি শেষ অনুরোধ মোর,
পূরণ করি' নির্ব্বংশতা করগো আজি দূর !"
জোর করি' বাপ চল্লে শেষে,
চক্ষু মুছি' অন্ধকারে, আপন ঘরের উদ্দেশে।
বিছানাতে লুটিয়ে পড়ে ভাব্‌লে মনে,—"হায় বিধাতা,
কোন পথে যাই অন্ধ আমি দেখাও হে পথ দৃষ্টিদাতা !
বংশ গত সংস্কারেরেই ঠেল্‌ব বা কোন বলে,
ছেলে যদি নাই বা বাঁচে মা'র জীবনও নিভ্‌বে চোখের জলে।
যা' হবে হোক্ তুষ্ট হ'য়ো দুর্গা দশভুজা,
আজ্‌কে যদি বাঁচে ছেলে পাঁটা দিয়ে কর্‌ব তোমার পূজা।"

দুর্গাদেবীর আশীষ জোরে,
আরো দু'দিন কাট্‌ল কেমন করে !
রাজ্যিজুড়ে পড়ি গেছে নিমেষ মাঝে আগমনীর সাড়া,
রুগ্ন ছেলের মুখের হাসি বাপ মায়েরে কর্‌ল আত্মহারা।
আনন্দেরি হাটের মাঝে,
পূজোর দু'দিন কাট্‌ল নানা কাজে।
মহাষ্টমীর গভীর রাতে আরতি সমাপনে,
বল্লে মাতা স্বামীর কাছে,—"মানত কথা নাইকি তোমার মনে ?
কাল নবমীর দিনে,
একটী ছাগে বলি দিয়ে বিমুক্ত হও দেবতার এই ঋণে।"
"দেখা যাবে" বল্লে স্বামী বদন নত করে ;
বল্লে মাতা "দেখবে কি আর, দেবতা লয়ে ছেলেখেলা কর্‌লেপরে
খোকার ব্যামো হয়নি আজো সারা,
কি হতে কি দাঁড়ায় শেষে বল্‌তে না যায় পারা।"
বল্লে পিতা,—"দেখব তবে,"
মাতা বল্লে,—"দেবতার ঋণ শোধ না দিলে তার প্রতিফল ভুগ্‌তে হ'বে।"

দ্বিপ্রহরে সাঙ্গ হ'লো শেষ দিবসের পূজা,
মণ্ডপের ওই বারাণ্ডাতে লয়ে চিন্তার বোঝা,—

দাঁড়িয়ে আছেন বাপ,
পক্কমাথায় পড়্‌ছে যেন লক্ষজীবের করুণ অভিশাপ।
মৈত্রবাড়ী এবার থেকে পূজায় পাঁঠাবলি,
সুরু হ'লো বলে গ্রামের বালবৃদ্ধ জুটুল সকলি।
রুগ্নছেলে অঙ্কে লয়ে মাতা
আসীন দেবীর চরণ তলে—লুপ্ত হৃদির ব্যথা।
দেখ্‌লে পিতা,—একটী পশুঘিরে,
হাজার মানবদৈত্য তা'দের হিংস্র প্রবৃত্তিরে
চরিতার্থ করবে বলে দাঁড়িয়েছে বনের পশুর ন্যায়,
ক্ষুদ্রজীবের নাইকো ভাষা অভিযোগের নাইকো অভিপ্রায়।
কেবল অবোধ চক্ষু দু'টী অর্থবিহীন একটু গলার সুর.
কোলাহলে পড়্‌ছে চাপা—আনন্দ নিষ্ঠুর।
ঢাক্‌বে বলে আর্ত্তপশুর অন্তিম রোদন,—
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর ঝাঁঝের হিংস্র আয়োজন।
ক্ষুদ্র জীবের নাই বিপদে জ্ঞান,
অবাক হ'য়ে সবার পানে করুণ দুনয়ান
চাইছে তুলে; মাগ্‌ছে কি ভিখ্‌ জানি,
আজ এহিংস্র পশুর মাঝে তাহার সহায় নাইকি কোনওপ্রাণী?
প্রণাম করে চল্লো বলিকর,
খড়্গ লয়ে আপন হাতের পর,
মহেশ্বরের প্রলয় ভেরীর ন্যায়
বাজলো বাদ্য, অবোধ জীবের করুণ সুরে হায়,
ভাসায়ে আজ কোথায় নিল কে জানে তার কথা,
পিতার মনে বাজ্‌ল শুধু সেই বারতা।
ঝাঁঝর শাঁখের সহস্রবাঁধ টুটি,
তাঁর শ্রবণে পৌঁছ্‌ল গিয়ে ছুটি'—
সহায় বিহীন একটী পশুর মরণকালের বাণী,
হায় কেমনে জানি!
হত্যালীলার নিঠুর উল্লাসধ্বনি,
বীভৎসতর হ'য়ে পিতার প্রাণের মাঝে পশ্‌ল অমনি।

দু'হাতে কাণ ঢাকি,—
মূর্চ্ছিত বাপ পড়্‌ল ভূমে আপন আসন থাকি'।
আড়ষ্ট কায় শীতল হ'ল নিমেষ পরে,
থাম্‌ল ঝাঁঝর শঙ্খ-নিনাদ মহাপূজার অবসানান্তরে।

কর্ম্মজীবনের সার্থকতা

অধ্যাপক দেবকুমার দত্ত এম, এ; বি, টি।

কর্ম্মময় জগতের ক্রোড়ে এমন জীব নাই, যে কোনও না কোনও রূপ কর্ম্ম না করে। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে বৃহত্তম জীব পর্য্যন্ত, সকলেই কোনও প্রকার কর্ম্মে লিপ্ত আছেই আছে। আপাতকর্ম্ম-হীন ব্যক্তিও দেহাদি-সংরক্ষার জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ বা তন্নিরোধাদি-রূপ কোনও বাহ্য অথবা চিন্তনাদিরূপ কোনও আভ্যন্তরীণ কর্ম্মে ব্যাপৃত। অহর্নিশ কর্ম্ম-সূত্র-বিধৃত এই জগতে যে ব্যক্তি একবার জন্মগ্রহণ করে, তাহার কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিবার উপায় নাই। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, স্বাধীনভাবে অথবা পরাধীনভাবে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য অথবা অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোনও কর্ম্মে জীব-জগৎ প্রতিনিয়তই নিয়োজিত—অন্যথা নাই।

এই কর্ম্মশীল জীবশ্রেণীর কর্ম্ম-প্রকৃতিতে বহু ভেদ। হৃৎপিণ্ড হইতে বায়ু-প্রবাহের নির্গমাগম, ধমনীসমূহে রক্তের প্রবাহ, জৈবিক দেহের গ্রহণ-বর্জ্জনজনিত পোষণ-বর্দ্ধন, সূর্য্যতাপাদিতে পুষ্প-কোরকের দলোন্মেষ ও ফলে পরিণতি প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম্ম যেন অন্ধ জড়শক্তির দ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতেছে, কীটাণুকীটের বসতি-নির্ম্মিত লূতার পাশবিস্তার পতত্রীর কুলায়-নির্ম্মাণ, গোবৎসাদির জন্মমাত্র ধাবন কুর্দ্দন, মানব শিশুর স্তনন্ধয়ন প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া যেন কেবলমাত্র সংস্কারজ-শক্তির দ্বারাই নিয়মিত হইতেছে, মানবের উত্থান উপবেশন, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য যেন অভ্যাসজ শক্তির দ্বারাই সাধিত আবার বিচার মার্গপ্রহিত চিত্তবৃত্তি, নৈতিক জীবন যাপনের প্রচেষ্টা, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম্ম যেন জ্ঞানজ শক্তিরই বিকাশ-নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তি সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও পূর্ণতর জীবের জীবনে সকল সময়ে ইহারা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নয়। কিন্তু তাহা হইলেও জ্ঞানজ শক্তির নিয়ন্তৃত্বেই পূর্ণতর জীবের উন্নতি, অভিব্যক্তি ও অধিকতর পূর্ণতায় পরিণতি। জ্ঞানজ শক্তির বিকাশের অভাবে সহস্র বৎসরান্তেও গোজাতির জীবন প্রণালীতে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু এই জ্ঞানজ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতেই মানবজাতির জীবনপ্রণালীতে কত বিভিন্ন বৈচিত্র্য।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীবই থাকুক পরিদৃশ্যমান জীবজগতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ মানবই সৃষ্টির রাজা। এই মানবে অধস্তন সর্ব্বজীবের স্বভাবের পূর্ণ পরিণতি আবার উর্দ্ধতন জীবসমূহের চারিত্রিক বিকাশের প্রারম্ভিক ভিত্তি। মানুষ পশুত্ব ও দেবত্বের সন্ধি ভূমি, জ্ঞান ও অজ্ঞানের সংহতমূর্ত্তি। আহার-নিদ্রা-ভয়াদি পশুভাবের অবলম্বন, অনুসরণ ও আরাধনায় মানুষ পশুতে পরিণত হইতে পারে আবার ভক্তি, প্রীতি, দয়া, দাক্ষিণ্য. জ্ঞানও ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া দেবত্বে সমারূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তথাপি মানুষ পশুও নহে দেবতাও নহে, উভয়ের সীমান্তরালবর্ত্তী জীব। মানবীয় ধর্ম্মের পালনের জন্য তাহাকে এই উভ-প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। দেবত্বের অধিকারী হইয়াও মানবজাতি অধিকাংশ সময়ই পশুভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। উভপ্রকৃতিতে জাগরূক মানুষকে প্রায় আজীবন এই দ্বিপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার জীবন দোলা একবার পশুত্বে আর একবার দেবত্বের সম্মুখীন হয়। এইরূপ দুলিতে দুলিতে যে মানব পশুত্বের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেবত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে, সেই মানবজীবনকে সার্থক করিয়া ধন্য হয়, আর যে দেবত্বের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পশুত্বের ভূমিতে আশ্রয় লয় সে মানব সমাজে নরাধম হইয়া সকলের কৃপার্হ হইয়া পড়ে।

অগ্রপশ্চাদ্ধাবি নিত্যদোদুল্যমান চিত্তদোলার অস্থৈর্য্য হইতে স্থির ভূমিতে সমুত্তীর্ণ হইবার পক্ষে মানবের সহায়—জ্ঞান, প্রীতি ও পুণ্যকর্ম্ম। অনন্ত কর্ম্মময় জগতে জ্ঞান ও প্রেম রূপ চক্ষু ব্যতিরেকে মানব প্রকৃত কর্ম্মের পথ দেখিতে পায় না। এই দুই চক্ষুই মানবকে কর্ত্তব্যের পথ দেখায় এবং ইহাদের ইঙ্গিতে দেহ যথাযথ স্থানে কর্ম্মশক্তির প্রয়োগ করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধিতে সাধনভূত হয়।

দেহের মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মশক্তি থাকিলেও জ্ঞান প্রেমাদির আধারভূত মস্তকই যেমন সমগ্র দেহের পরিচালক, মানব-সমাজ বা মানবজাতির মধ্যেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মশক্তি থাকিলেও অধিকতর জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী ব্যক্তিই সমগ্র সমাজ বা জাতির নেতৃত্ব লাভ করে। যদিও প্রত্যেক মানুষই একটু না একটু জ্ঞান ও প্রেমাদির অধিকারী, কারণ তাহা না হইলে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহই ভার হইয়া পড়ে, তথাপি মানব অধিকাংশ সময়েই অচেতনভাবে মৃত গতানুগতিক অভ্যাস গত জীবন যাপন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। জ্ঞান প্রসৃতি চিন্তার অধিকারী হইতে চাহে না। এই হিসাবে সাধারণ মানব শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকার প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার জীবনকে সার্থক করিতে পারে না, আবার সেই উচ্চ অধিকার লব্ধ মানব সমূহের চিন্তার রীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই উচ্চাধিকারে উপনীত হয় ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া প্রত্যেকেই অল্পাধিক ভাবে নিজ নিজ জীবনে সার্থকতা আনয়ন করে।

জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের ত্রিধারাকে জীবনে একত্র সঙ্গত করিয়া মানবজীবনকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যেই মানবের নানারূপ শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা। এই শিক্ষা প্রথমতঃ ও প্রধনতঃ দেহ, মন ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে, পরে মানবকে অন্তদুর্গম, মহত্তর ক্ষেত্রে লইয়া উপস্থাপিত করে। প্রথম সোপানে দেহকে পবিত্র ও বলশালী মনকে পূত ও প্রশস্ত, ধীর ও গম্ভীর, উদার ও উন্নত এবং হৃদয়কে দৃঢ়, কোমল, বিশাল ও প্রীতিপূর্ণ করিতে হয়।

স্নান শৌচাদির দ্বারা দেহের বাহ্য পবিত্রতা ঘটিলেও এবং সুনিয়মিত আহার ও অঙ্গ চালনাদির ব্যবস্থার দ্বারা দেহকে বাহ্যতঃ সুস্থ, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ

করিতে পারিলেও এই শুদ্ধি পুষ্টি প্রভৃতি বহুমানে ও কখনও বা সর্ব্বতোভাবে অন্তর শুদ্ধি ও পুষ্টির উপর নির্ভর করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, বায়ু, উপস্থ—এই জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিধৃত, চালিত ও প্রতিভাসিত। দৈহিক তুষ্টি, পুষ্টি. বল বৃদ্ধি ও শুদ্ধি মানসিক তুষ্টি, পুষ্টি, বল শালীত্ব ও শুদ্ধি হইতে সমুদ্ভূত হইত। মনকে শুদ্ধ করিতে না পারিলে বহিঃ শৌচের সহস্র বিধানেও দেহ শুদ্ধি ঘটে না, মন বলিষ্ঠ না হইলে দেহে অযুত হস্তীর বল থাকিলেও দেহ আপনাকে দুর্ব্বল জ্ঞান করে। অবশ্য, দেহ নিতান্তই দুর্ব্বল হইলে অতি বল সম্পন্ন মনও সময় বিশেষে ব্যর্থ প্রযত্ন হয় সত্য। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের জন্য দেহমনের সমভাবে শুদ্ধি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি আবশ্যক।

মানসিক শুদ্ধি, পরিপুষ্টি ও বল বৃদ্ধির প্রধানতঃ তিনটি উপায়—(ক) উপযুক্ত শারীর শ্রম, (খ) সংযম ও শুচিতা এবং (গ) উচ্চ জ্ঞানের অনুশীলন ও চিন্তা শক্তির প্রসার।

মানসিক শক্তি বিকাশে শারীর শ্রমের অদ্ভুত কার্য্যকারিতা দেখা যায়।

মানসিক শিক্ষায় সংযম ও শুচিতা অমূল্য বস্তু। বৃক্ষ শিশুকে অসংখ্য জীব নিচয়ের আশ্রয় দাতা মহা মহীরুহে পরিণত করিতে হইলে যেমন রোপণ সময়েই তাহার চতুর্দ্দিকে একটী বেষ্টনীর প্রয়োজন, মানব জগতে অসংখ্য কর্ম্ম সাধনের জন্য আগত মানব শিশুকেও সেইরূপ বিশাল কর্ম্ম জগতের উপযোগী করিবার জন্য প্রথমেই সংযম ও শুচিতার বেষ্টনীর মধ্যে রক্ষা করা প্রয়োজন। বৃক্ষ শিশুর বেষ্টনী বাহির হইতে দিলেই চলে কিন্তু মানব শিশুর সংযমের বেষ্টনী, বিশেষতঃ যৌবনের উচ্ছলতার স্ফূর্ত্তি ভিতর হইতে তাহার নিজের দ্বারাই না দিলে চলে না। মানব শিশু বা মানব যুবার মনে যে প্রবল বাসনা বা প্রবৃত্তি জাগে, তাহার সাধনের জন্যই হয়ত সে নরলোকে আসিয়াছে, কিন্তু সেই কর্ম্ম সাধনের যথার্থ শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য তাহার কাল প্রতীক্ষাদির বিশেষ প্রয়োজন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়্‌রিপুর প্রলোভন হইতে সতত আত্মরক্ষা করিতে হয়। অনেক সময়ে প্রবৃত্তি অসৎ না হইলে তাহার রোধ করিয়া ও বল পূর্ব্বক কোনও সৎ প্রবৃত্তিকে সময় বিশেষে জাগাইয়া মানব তাহার মত্ত হস্তীর তুল্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াই পরম সুখে কালাতিপাতের অধিকারী হয়। সকল রিপুর মধ্যে কামই অতি প্রবল রিপু। বিষয় বিশেষে অতিশয় আসক্তি বশতঃ এই রিপুর উদয় হয়, ইহা হইতেই ক্রোধের জন্ম, সেই ক্রোধ হইতে মোহ ও মোহ হইতে স্মৃতি ভ্রংশ এবং স্মৃতি ভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ ও তাহা হইতেই বিনাশ।

গুরূপদেশ শ্রবণ, নানা জ্ঞানগর্ভ সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা. সত্যশাস্ত্রের অনুশীলন ও উচ্চ বিষয় সমূহের চর্চ্চার দ্বারা লব্ধ বিষয়ে অভিনিবেশ ও বিচার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়, চিত্ত প্রসারিত উন্নত ও বলিষ্ঠ হয়। এই প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই মানবের কর্ত্তব্য বুদ্ধি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে থাকে মানুষ আপনার মধ্যে সৃষ্টি ও রক্ষার গভীর দায়িত্ব অনুভব করিতে থাকে।

এই দায়িত্বটীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১)মানবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও মঙ্গল কামনায় যাঁহারা সত্যের সন্ধানে ছুটিতে ছুটিতে জীবনের প্রতি শোনিতবিন্দু উৎসর্গ করিয়া সত্যের আবিষ্কার ও উদ্ধার সাধন করিয়া সত্যদ্রষ্টা বলিয়া জগতে পরিচিত হইলেন, তাঁহাদের সেই সত্যকে ধারণ, রক্ষণ ও জগদ্‌বাসীর নিকট পরিচিত করাইবার এবং তাহারই সহিত আপনাপন সত্যানুসন্ধিৎসাকে জাগাইবার দায়িত্ব, (২) যুগযুগান্তের যে

অতীত, যুগযুগান্তের ক্রমানুবর্ত্তী যে বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠাতা, সেই অতীতের দোষত্রুটী সম্পন্ন পতন প্রতীকার করিয়া অথবা উন্নত বর্ত্তমানের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুন্দরতর ভবিষ্যের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং (৩) প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রচনা, অতি সূক্ষ্ম কণিকা হইতে মহাব্যোম পর্য্যন্ত যাঁহার শক্তিসত্তায় সমুদ্ভাসিত যাঁহারা অনন্ত অনীলশক্তির মূর্ত্ত অভিব্যক্তি এই মানব জীবন তাঁহার উপলব্ধির দ্বারা তদনুকূলতায় আত্মসমর্পণের দায়িত্ব।

মানব জীবনের প্রতিপদে সত্যের অভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া পড়ে। পরস্পর পরস্পরকে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে, কত কত দীন দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখাবলোকন করে, তথাপি তাহার অভাব পূর্ণ হয় না। কেহ সত্যের বাণী শুনাইলেও তাহাতে বিশ্বাস হয় না, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় না। ইহার কারণ, যাহা সত্য তাহাকে নিজ শক্তির দ্বারা লাভ করিতে হয় নতুবা শান্তি হয় না। এজন্য অতীত যে সমুদায় সত্যরাজ্যের সন্ধান করিয়া তাহার আবিষ্কার করিয়াছেন, বর্ত্তমানকে তাহার সমুদায় শক্তির প্রয়োগে তাহা অধিকার করিতে হইবে এবং অন্যান্য অভাববিমোচনের জন্য নূতনতর সত্যের সন্ধান করিতে হইবে। কেবলমাত্র পিতৃরাজ্যের বিবরণ পুস্তিকাখানি লইয়া যে রাজপুত্র জীর্ণ শীর্ণ দেহে শতছিন্নকন্থায় আবৃত হইয়া অভুক্ত ভাবে ভগ্নপর্ণশালায় দিনাতি বাহন করে, পিতৃরাজ্যের কোনও সম্পদ উপভোগ করা দূরে থাকুক্ একবার দর্শন করিবারও অধিকার পায় না, তাহার পক্ষে সেই পিতৃরাজ্যের অস্তিত্ব সত্য হইয়াও যেমন মিথ্যা, তাহার পিতা যেমন ভাবিতে পারেন যে বংশধরের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলাম, হায় সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল, সেইরূপ সম্পদ্ উপভোগের কথা দূরে থাক্, দর্শনের কৃতার্থতা মাত্র লাভ না করিয়া নামে মাত্র অতীতের উত্তরাধিকারী মানবকুল যদি অতীত মহামানবের আবিষ্কৃত সত্যরাজ্যের বিবরণ পুস্তিকা লইয়া দীনমলিন ভাবে জীবন যাপন করে, সত্যরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটনের মন্ত্র তাহাদেরই হস্তে, এই কথা আকাশ ভেদী কণ্ঠনাদে উচ্চারণ করিলেও তাহাদের জীবনে তাহার পরিচয়ের অভাবে কেহই তাহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহা মিথ্যা হইয়াই থাকিবে এবং জগতের মহামানবগণও হয়ত আজ দুঃখের সহিত বলিতেছেন—হায় ভবিষ্যৎ মানব-বংশধরগণের জন্য যে সত্য আবিষ্কৃত হইল, যে সত্য সমূহের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহারা তাহা হইতে বহু দূরে! অধিকারের অভাবে পার্থিবরাজ্য যেমন হস্তচ্যুতও বিলুপ্ত হয়, অধিকারের অভাবেই জ্ঞানময় সত্যরাজ্যও সেইরূপ অপকৃত ও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। উন্মুক্ত ও উদার প্রাণে আশা ও বিশ্বাস নিয়া সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়।

চিরবিকাশময়ী প্রকৃতির সৃষ্টিজালে আবদ্ধ, অতীতের সাক্ষী বর্ত্তমান মানব অতীতের নিকট হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে দেহ মনঃপ্রাণ, জীবন প্রণালী, জীবনের অশেষবিধ সুখ-দুঃখ সম্পদ বিপদ কত কি লাভ করিয়াছে তাহার অন্ত নাই, আবার ভবিষ্যৎকে যে সেই দেহমনঃপ্রাণাদি কতকেই দিয়া থাকিবে। এই আদান প্রদানের দায়িত্ব হইতে সহসা মুক্তিলাভের কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না; সুতরাং পূর্ণতর, নূতনতর উন্নততর দেহমনঃপ্রাণাদির অধিকার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে দিয়া যাইতে পারিলেই অন্ততঃ তাহার জন্য সর্ব্বদা সচেতন ও সচেষ্ট থাকিলেই বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যতের নিকট কতক পরিমাণে দায়িত্ব বিযুক্ত থাকিতে পারে।

ভক্তি, প্রীতি, দয়া দাক্ষিণ্য মহানুভবতা প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়কে সব সময়ে কোমল এবং তাহার সহিত

তাহাকে দৃঢ় করিতে না পারিলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করা কঠিন। অনুভূতিই বুদ্ধিজনিত কর্ম্ম শক্তির একমাত্র প্রসূতি না হইলেও তাহাকে বাঁচাইয়া ও জাগাইয়া রাখে। এইজন্য এই হৃদয়ের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্রই নিতান্ত প্রয়োজন।

দেহহৃদয়মনে উন্নত মানব যখন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপ মহাশক্তির মধ্যে আপনাকে একীভূত ও লীন দেখিয়া সেই উপলব্ধিজাত মহানন্দে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতেই আপনাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রধাবিত হয় তখনই মানবের কর্ম্মজীবন সার্থক হয়।

রক্তের ঋণ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

১

ক্ষিপ্ত তরঙ্গিনীর উচ্ছ্বসিত বারিরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া তটভূমে আঘাত করিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দ্বিগুণ শক্তিদ্বারা সরোষ আঘাতে শস্য শ্যামল তটভূমির বিস্তৃত লক্ষ ফাটল জর্জ্জরিত ভূভাগ আপন কুক্ষিতে পুরিয়া লইতেছে। উদ্দাম জলস্রোতের খরপ্রবাহ সহস্রফণা বিস্তার করিয়া সরোষগর্জ্জনে সান্ধ্য প্রকৃতির প্রশান্ত বক্ষ-জোড়া সুপ্তি শিথিল নীরবতা ছিন্নভিন্ন করিয়া উত্থিত হইতেছে; আর স্তরে স্তরে ধরিত্রীর বক্ষপঞ্জর উন্মত্ত ভুজঙ্গিনীর দুর্জ্জয় রোষাঘাতে খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িতেছে।

আজ সন্ধ্যায় রতিকান্ত মায়ের চিতায় বাতি দিতে আসিয়া ভাগীরথীর এই ভয়াবহমূর্ত্তি দর্শন করতঃ বিস্মিতভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নদী যেমত দ্রুত লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে আজ রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ না করিলে হয়ত তাহার জমি জমার সঙ্গে তাহাদের সকলকেই নদীগর্ভে সলিল-সমাধি লাভ করিতে হইবে। তাহার পাড়া-প্রতিবাসী সমস্তই হালের গরুবাছুর লইয়া গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়াছে তাহার যাওয়া হয় নাই কারণ সে তাহার স্বর্গগত জননীর একমাত্র মর্ত্ত্যের স্মৃতিস্তম্ভ কোন নিষ্ঠুর বিধাতৃ বিধানের অধিকারে ফেলাইয়া রাখিয়া যাইতে পারে? রতিকান্ত চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল সান্ধ্যনীলিমার ঘনীভূত ধূসর-লেখা পশ্চিম পারের গ্রামগুলির উপর ঘনমসী লেপিয়া দিয়াছে; নিস্তব্ধ শান্ত প্রদোষ প্রকৃতির গায়ে যতদূর দেখা যায় কেবল অন্ধকার—অন্ধকার অন্ধকারকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া এক বিচিত্র বীভৎসতাময় অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছে। আর অদূরে উন্মাদিনী ভাগীরথীর রোষক্ষিপ্ত উদ্বেলিত বারিরাশির চঞ্চল বক্ষোদেশে সহস্র সহস্র ক্ষিপ্ত বীচিমালা দলবদ্ধ ভাবে তটভূমে আঘাত করিয়া অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া মরিতেছে

আর বেগবতী গঙ্গার অবিশ্রাম ভৈরব-গর্জ্জন সান্ধ্যআকাশের গভীর নীরবতার অঙ্গে নির্লিপ্ত হইয়া যাইতেছে। অদূরবর্ত্তী বেতসবনের সমগ্র অবয়বখানা খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিতপাবনীর বক্ষে ধ্বসিয়া পড়িল। ঘনসন্নিবিষ্ট কাশ গাছগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একে একে অস্তিত্ব হারাইতেছে আর যেখানে বনঝাউগুলি দক্ষিণদিকের বালুর চড়াটা নিবিড় আঁধার করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে রোষময়ী তরঙ্গমালা দ্বারা সমাবৃত হইয়া নিমেষে পিশাচবর্গের তাণ্ডব নৃত্যলীলাভিনয়ের ক্ষেত্র হইল। নিথর নিস্তব্ধ প্রদোষপ্রকৃতি কান পাতিয়া জাহ্নবীর এই তাণ্ডব ধ্বংস-স্পৃহার বিচিত্র অভিনয় অতি সন্তর্পনে শ্রবণ করিতেছে।

রতিকান্ত এমত বীভৎসতাময় দৃশ্যদর্শনে শিহরিল কিন্তু নির্ভীকচিত্তে হারিকেনটা হাতে লইয়া চিতার দিকে অগ্রসর হইল। বাতিটা যথাস্থানে নামাইয়া রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইল যে সমস্ত পাচিল-ঘেরা যায়গাটা জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড ফাঁটল দিয়াছে; তরঙ্গমালার অনবরত তটাঘাতে এখনই হয়ত এই সমস্তটা যায়গা নদীগর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়িবে। রতিকান্ত ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিল।

কতকদূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; ফিরিয়া দেখিল বিক্ষুব্ধ নদীবক্ষের উচ্ছ্বসিত বারিরাশি মথিত করিয়া অগণ্য ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালা মহোল্লাসে বিচ্ছুরিত ফেণপুঞ্জ শীর্ষধারণপূর্ব্বক তাহার পূজ্যা মাতৃদেবীর শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু স্বীয় করাল কুক্ষিতে গ্রাস করিয়া লইবার জন্যই দলে দলে ধ্বংসের বীভৎসতাময় মূর্ত্তি লইয়া অগ্রসর হইতেছে। আর তাহাদের অবিশ্রাম আঘাতের ফলে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই পাচিল-ঘেরা মাটির ঢিপিটী ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রতিকান্ত একদৃষ্টে চিতার আসন্ন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিল। ভয়ে আরো কয়েক পদ পিছাইয়া গেল।

পশ্চাতের গ্রামগুলি প্রদোষের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে রতিকান্ত একাকী বীভৎসতাময়ী গঙ্গার রুদ্রমূর্ত্তির তাণ্ডব ধ্বংস কৌতুক নিশ্চল প্রস্তর খোদিত চিত্রের ন্যায় বসিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। আজ তাহার স্নেহময়ী জননীকে চিরতরে ভুলিতে হইবে, যে তুচ্ছ স্মৃতিচিহ্নটুকু সে এতদিন বুকের রক্ত দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও নিষ্ঠুর বিধাতার সহ্য হইল না তাহাও এই দুর্ব্বল সন্তানের চক্ষের সম্মুখে এমন করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। রতিকান্তের আজ আবার সুদীর্ঘ আট বৎসর অন্তর মায়ের কথা স্মরণ হইয়া দুই চক্ষু ছাপিয়া জল আসিল, সে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উন্মাদিনী তরঙ্গিনীর ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসের ও তাহার ভীমকল্লোলস্বনের আর বিরাম নাই; উদ্দাম-তরঙ্গমালা রতিকান্তের অশ্রুজলকে উপেক্ষা ভরে বিদ্রূপ করিয়া লক্ষহস্তে করতালি দিয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিল। রতিকান্ত শুনিতে লাগিল, একদল শৃগাল সমবেত কণ্ঠে তারস্বরে পশ্চাতের নিবিড় অন্ধকারের আবরণের ভিতর হইতে ডাকিয়া উঠিল আর তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া গঙ্গার অপরতীর হইতে দুই একটা হিংসুটে কুকুর প্রতিধ্বনি তুলিতেছে; নিস্তব্ধ আঁধারের প্রশান্ত বক্ষতল ভেদ করিয়া পশুদলের এই চীৎকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া ভাগীরথীর ভৈরব গর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে।

রতিকান্ত ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে পাইল, চিতার ক্ষুদ্র প্রদীপখানি এখনো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে আর

উন্মত্ত তরঙ্গরাজির অবিশ্রান্ত সরোষআঘাতের ফলে অন্যূন এককাঠা জমী ব্যাপিয়া আর এক মারাত্মক ফাঁটল দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে জোয়ারের জল ফুলিয়া ফুলিয়া আসিয়া কূল ছাপিয়া দিল আর তাহাতে তৈলহীন নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপ খানি ভাসিয়া গেল, রতিকান্ত প্রাণভয়ে দৌড়িয়া আরও পিছাইয়া আসিল। যে তুচ্ছ প্রদীপ শিখা রতিকান্তের পুণ্যময় মাতৃস্মৃতির শেষচিহ্নটুকুকে তখনো বাঁচাইয়া রখিয়াছিল, তাহা তরঙ্গের আঘাতে কখন নিভিয়া গিয়াছে। সে দেখিল চারিদিক হইতে ঘনমসীমাখা রজনীর প্রলয় তিমির তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, রতিকান্ত সভয়ে চক্ষু মুদিল।

ইতোমধ্যে ভাটা আরম্ভ হইয়াছে, অবিরাম নর্ত্তনশীল দুর্জ্জয় তরঙ্গরাজি যৌবনমদে ক্ষেপিয়া অন্ধকারের মধ্যে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে। রতিকান্তর মনে আশার সঞ্চার হইল, ভাবিল এখনি হয়ত তাহার মায়ের চিতা স্থান পুনরায় ভাসিয়া উঠিবে।

বিক্ষোভিত জলরাশি ঘোরগর্জ্জনে তাণ্ডব কৌতুকের অভিনয় করিতে করিতে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া যাইতে লাগিল। রতিকান্ত উৎসুক আগ্রহে চাহিয়া রহিল। অদূরে নদী বক্ষস্থ জলস্রোতের বিকট অট্টহাস্য দিগন্তের প্রান্তদেশে ঘা খাইয়া ভাটার শোঁ শোঁ শব্দের সঙ্গে আসিয়া মিশিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে জোয়ারের জল সরিয়া গেল আর নিমেষে চিতাশুদ্ধ পাঁচিল ঘেরা সমস্ত ভূভাগ নদীবক্ষে ধ্বসিয়া পড়িল।

নিরুপায় হইয়া রতিকান্ত সভয়ে "মা—মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল আর নদীবক্ষের উন্মত্ত তরঙ্গপুঞ্জ উপেক্ষাভরে লক্ষকণ্ঠে অট্টহাস করিয়া তাহাকে বিদ্রূপের সুরে মুখ ভেঙচাইয়া দিল।

২

পশ্চিম-মাঠের বুকের উপর গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। রতিকান্ত পূর্ব্বরাত্রির হিম মাথায় করিয়া স্ত্রী পরিবার ও গরু বাছুর সহ রাধানগর চলিয়া আসিয়া যে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করিতেছিল তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। দরিদ্র শ্বশুর অগত্যা গ্রাম্য বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লইল।

মাটীর দেয়াল-ঘেরা একটী অপরিসর গৃহ কোণে একখানি শতছিন্ন মাদুরের উপর শায়িত রুগ্ন রতিকান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কন্যা কিরণীকে ডাকিয়া বলিল,—"সন্ধ্যা যে হয়ে এল, মা!"

বাড়ীর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে আজ অপরাহ্ণ হইতে রতিকান্ত প্রলাপ বকিতেছে। এই বিকারগ্রস্ত রোগী একমাত্র কন্যাকেই আজ বিকাল হইতে অসংলগ্ন ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া ফেলিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের সদ্য বিবাহিত পত্নী সারদামণি পিতা-মাতার সম্মুখে স্বামীর কাছে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না, তাই এই দশ বৎসরের বালিকাকেই আজ পিতার সহস্র আব্দার রক্ষা করিতে হইতেছিল।

পিতার প্রশ্নে কিরণী সংক্ষেপে উত্তর দিল,—"হুঁ, তা হ'য়ে এল বৈ-কি।"

রাতিকান্ত আব্দারকণ্ঠে বলিল,—"তবে, দে না মা, হারিকেনটা জ্বালিয়ে দে,' আজ যে মা'র চিতায় বাতি দেওয়া হ'লো না!"

কিরণী পিতাকে বুঝাইয়া বলিল,—"নদীর জলে বাড়ী ঘরই কোথায় ভেসে গেল, তারই খোঁজ পাওয়া যাবে না, আর চিতার যায়গাটাত কাল্‌কে ভেঙ্গে পড়ে যেতে তুমি নিজ চক্ষে দেখে এসেছ, তার আর খোঁজ পাবে, বাবা?"

রতিকান্ত বাধা দিয়া বলিল,—"তুই আর বাধা দিস্ নে, মা, আমি বেঁচে থাকতে মরা মানুষের

কথায় অবাধ্য হ'তে পারবো না, মা'র চিতা যেখানেই থাক্ আমি খুঁজে বার কর্‌বই, দে, মা হারিকেনটা জালিয়ে দে' আমি বল্‌ছি আঁধার হ'য়ে গেল যে।"

কিরণী বিরক্ত হইয়া বলিল,—"জ্বরে তোমায় মাথা ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে, তুমি কি করে এই এক ক্রোশ রাস্তা খাল ধরে ডিঙ্গি বেয়ে নদীর ধারে যাবে, তুমি কি পাগল হ'লে নাকি!"

রতিকান্ত ধমক্ দিয়া কহিল,—"পাগল আমি হ'লেম না তোরা হ'লি রে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, মায়ের চিতায় বাতি দেওয়া হয়নি; একটা হারিকেন জালিয়ে দে'বল্‌ছি; শীগ্‌গীর দে'।"

কিরণী অন্য মনস্কভাবে বলিল,—"কি যে বল্‌ছ, তার কিছুই ঠিক নেই।" ক্রুদ্ধ রতিকান্ত চক্ষের পলকে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই শিয়র প্রান্ত স্থিত কেরাসিনের কুপীটা লইয়া কন্যার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। দারুণ আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে কিরণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রদীপ নিভিয়া যাওয়ায় সমস্ত গৃহ খানি সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে নিমেষেই সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রতিকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু মাথাটা রিম্ রিম্ করিতে লাগিল, ধড়াস্ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অজ্ঞানভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল যখন পুনরায় চৈতন্যলাভ করিল তখন দেখিল মেঝের উপরে অঞ্চলপ্রান্ত বিছাইয়া সারদামণি অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। রতিকান্ত বুঝিল, তাহার স্ত্রী এতক্ষণ তাহারই শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর অন্যান্য সকলই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। অন্ধকার সন্ধ্যার সমস্ত বেদনাময় চিন্তাধারা হৃদয় পটে ক্রমে উদিত হইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে যেন সজোরে কশাঘাত করিল। রতিকান্ত ভাবিল আজ সুদীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী সে তাহার মৃতাজননীর অন্তিম আজ্ঞার লক্ষ বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়াও পুরণ করিয়া আসিতেছে; আজ সে জীবিত থাকিতে তাহার অন্যথা সন্তান হইয়া কোন চক্ষে দর্শন করিবে?

রতিকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, তিমির-বসনা নৈশ প্রকৃতি যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। গৃহ কোনস্থিত মাটীর প্রদীপটা একটা কাচের লণ্ঠনে পুরিয়া লইয়া দরজার পাশ হইতে একটি মজবুত পাচন সঙ্গে লইল। অতঃপর কাঁথাটা গায়ে ভালমতে জড়াইয়া অতিসন্তর্পণে স্ত্রীর অজ্ঞাতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল।

রাধানগর গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া একটী অপরিসর খাল সোজা দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহাদ্বারা একক্রোশ পথ অগ্রসর হইলেই বড় নদীতে গিয়া পড়াযায়। রতিকান্ত খালের ধারে গিয়া উপস্থিত হইল। অতিসন্তর্পণে প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া রতিকান্ত খালের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল নিকটেই তাহার শ্বশুরের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানা বাঁধা রহিয়াছে। একহস্তে পাচন ও অপর হস্তে লণ্ঠন সহ রতিকান্ত কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকায় উঠিয়া ইহার খুটি সংবদ্ধ দড়ি খুলিয়া দিল।

পশ্চাতের গলুইয়ে উপবিষ্ট হইয়া লাগি দিয়া প্রাণপণে ডিঙ্গি ঠেলিয়া দেখিল যে নৌকার তলদেশ একমত পাঁকে পুতিয়া রহিয়াছে। নৌকা হইতে পুণরায় হাটুজলে অবতরণ করতঃ আপ্রাণ চেষ্টায় ঠেলিয়া ইহাকে খালে নামাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপনি উঠিয়া বসিল।

বড় নদীর নিকটে বলিয়াই খালে যথেষ্ট স্রোত ছিল, রতিকান্ত ডিঙ্গিকে স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়া লগি রাখিয়া বৈঠা হাতে লইল। স্রোতের প্রবল টানে অন্ধকারের বুক চিড়িয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

খালের উভয়তীরে ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশবনগুলি অন্ধকারের মধ্যে গা ঘেষাঘেষি করিয়া দাড়াইয়া নিস্তব্ধ নিশীথিনীর ভয়াল নীরবতার ভিতর দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। বালুর চড়ার উপর বনঝাউগুলির আঁড়ালে আব্‌ডালে খদ্যোতের ক্ষণিক দীপ্তি-রেখা মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হইয়া রতিকান্তের নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছিল। আর সারি সারি খালের দুই কিনারার কাশবন সমূহের নব পুষ্পোদ্গমে সুমন্দ-সৌরভরাশী নৈশ-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া দিগন্তের গায়ে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। ঊর্দ্ধে কৃষ্ণবর্ণ গগনমণ্ডল, তাহাতে কোটী নক্ষত্রের ঝিকিমিকি কিরণোজ্জল খালের স্বচ্ছসলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া একখণ্ড শতধা বিভক্ত কাচের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। বৈঠার আঘাতে জলের মধ্য প্রতিক্ষণেই "ঝুপ্‌ ঝুপ্‌" শব্দ উত্থিত হইয়া দুর গগনের অসীমতার মধ্যে লীন হইতে লাগিল।

দুর্ব্বল দেহে অত্যোধিক পরিশ্রম জনিত রতিকান্তের ক্লান্তি অনুভূতি হইতেছিল, সে সর্ব্বতোভাব স্রোতের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া বৈঠা খাড়া করিয়া ধরিল।

কতক অগ্রসর হইয়া রতিকান্ত দেখিল পূর্ব্বকাশের অন্ধকার জাল ছিঁড়িয়া কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র বাঁশবনের মাথার উপর দিয়া উঁকি মারিয়াছে; আর তাহার স্নিগ্ধ কিরণ রশ্মি জলের উপর লুটিয়া পড়িয়া অবিশ্রাম ক্ষুদ্র তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত হইতেছে। রতিকান্ত আশান্বিত হইয়া জোড়ে বৈঠা বাহিয়া চলিল।

অনুকূল স্রোতের টানে ডিঙ্গি সত্বর নদীতে আসিয়া পড়িল। রতিকান্ত দেখিল চন্দ্রালোকে যতদুর দেখা যায় কেবল অনন্ত জলরাশী; সম্মুখে অবিশ্রাম ভৈরব গর্জ্জন করিতেছে; আর নদী স্রোতের খর প্রবাহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাক খাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটীয়া চলিয়াছে। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহাঃশৈত্য অনুভূত হইতেছিল তাই কাঁথাটা ভাল মতে জড়াইয়া হুস করিয়া বৈঠা বাহিতে লাগিল। সে ঠাহর করিয়া দেখিল সম্মুখেই গতিভঙ্গ প্রযুক্ত জলস্রোত দুর্নিবার ঘুর্‌পাক্ খাইয়া এক ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে। সে নৈপুণ্যভরে ডিঙ্গি তাহার পাশ কাটিয়া লইয়া নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

উত্তরদিকে মোচর ফিরিয়া কতক অগ্রসর হইলেই তাহার গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল। এই উন্মত্তপ্রবলস্রোতের উজান বাহিয়া চলিতে—অনেক বড় বড় অর্ণবযানকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, রতিকান্ত তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিল না। সে এতক্ষণ উৎফুল্লাঅন্তঃকরণে ডিঙ্গির ধারাল বক্ষ সংযোগে তরঙ্গরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া করিয়া গ্রামের নিকটে আসিয়া পহুঁছিয়াছে। নদীর পুর্ব্বধার দিয়া দিয়া তাহার বাড়ীরনিকটে অগ্রসর হইবার পথে সহসা ডিঙ্গি চড়ায় আট্‌কিয়া গেল। রতিকান্ত আশান্বিত হইয়া বৈঠা রাখিয়া দাঁড়াইয়া চাঁদের আলোকে দেখিল সম্মুখেদিকেও বড় একটা চড়া পড়িয়াছে এবং নদীতে ভাটা আরম্ভ হওয়ায় তাহাতে স্পষ্ট দেখা গেল যে তাহার মা'র চিতার উপরিস্থিত প্রকাণ্ড বটগাছটা পূর্ব্বরাত্রে উপ্‌রাইয়া পড়িয়া অর্দ্ধেক পাঁকে পুতিয়া রহিয়াছ। রতিকান্ত মার চিতার খোঁজ পাইল, আনন্দ বিহ্বল চিত্তে ঝাউবনের মধ্য দিয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়া লগি হাতে লইল। ঝাউবন পাছে ফেলিয়া ডিঙ্গি কতক অগ্রসর হইলে রতিকান্ত লক্ষ্য করিল সম্মুখের বালুর চড়াটায় যাওয়া সহজসাধ্য নহে। ইহার চারিদিক ঘেরিয়া উন্মাদিনী তরঙ্গিনী অবিশ্রাম তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আর ক্ষিপ্ত জলস্রোত ইহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনবরত প্রদক্ষিণ করিতেছে। ডিঙ্গির মুখ একটু ঘুরিলেই

আর রক্ষা নাই। নির্ভীক চিত্তে রতিকান্ত বৈঠা হাতে লইল, কিন্তু প্রবল স্রোত ঠেলিয়া কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। রতিকান্ত দাঁড়াইয়া বামহস্তে সজোরে হাল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কাচের লণ্ঠনটী গ্রহণ করিতে চাহিল সহসা ক্লান্ত হস্ত হইতে বৈঠা ছুটিয়া গিয়া ডিঙ্গির মুখ ঘুরিয়া গেল আর পরমুহূর্ত্তেই লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ তরঙ্গের একসঙ্গে আঘাত ফলে ডিঙ্গি গঙ্গার বক্ষে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। উন্মত্ত তরঙ্গের দল রতিকান্তের প্রাণহীন দেহ শীর্ষে ধরিয়া চড়ায় আনিয়া নামাইয়া রাখিল। নৈশচন্দ্রিকার সুস্নিগ্ধ বিভা রতিকান্তের মরণপাণ্ডুর বিশীর্ণ বদন মণ্ডল দিব্যজ্যোতীতে সমুদ্ভাবিত করিয়া দিল।

জ্ঞান ও ভক্তি

ভকতি কহিল জ্ঞানে, 'বুঝি আমি অনুমানে
তুমি বট মোর পদদাস।
নতুবা নিয়ত কেন মোর পিছু ভ্রম হেন
লভিবারে আমার আশ্বাস।'
এত শুনি কহে জ্ঞান 'মিথ্যা তব অনুমান
মিথ্যা তব বৃথা অহঙ্কার
তোমারে রাখিতে ধরি তোমার পশ্চাৎপরি
আমি শুধু ভ্রমি অনিবার।'

স্বর্ণরেণু

শিলঙের পথে

শ্রীপ্রফুল্লমোহন্ চৌধুরী।

আমার সৌভাগ্য বশতঃ ২ দিনের মধ্যেই শিলং যাত্রার একটি ভাল সময় মিলিয়া গেল আমার পরিবারস্থ ১টি লোকই কিছুদিন পূর্ব্বে শিলং গমন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে রাস্তা সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন "ভোলাগঞ্জ হইতে খাসিয়া যাওয়ার রাস্তায় ছড়ার জল এত খাড়া হইয়া পড়িতে থাকে যে নৌকা উজান দায়। নৌকা একবার ছুটিতে পারিলে পাথরে লাগিয়া একেবারে চুড়মার। ভোলাগঞ্জ হইতে মুসমাই ৭ মাইল রাস্তা। ভোলাগঞ্জ খাসিয়া পাহাড়ের নীচে এবং মুসমাই একেবারে উপরে। এই ৭ মাইল রাস্তা ক্রমান্বয়ে উপরে উঠিতে হয়। মাঝখানে বুড়ীরবাজার হইতে মুসমাই ৩ মাইল রাস্তা এত খাড়া যে প্রত্যেক দুইটি ধাপে একেবারে মাথার উপর আসিয়া উঠিতে হয়—একবার পা পিছলাইলে আর হাড়ের লাগাল পাওয়া যাইবে না। নিকটেই ধানের গোলায় উঠিবার একটি সিড়ি ছিল। একটি concreet example দেখাইবার জন্য তিনি সেটিকে ৮৯·৯ ডিগ্রি খাড়া করিয়া তাহাতে ২।১ ধাপ উঠিয়া দেখাইলেন। যাত্রার পূর্ব্বের দিন সমস্ত ঠিক ছিল। যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিজেদের নৌকায় সুনামগঞ্জ যাত্রা করিলাম। তৃতীয় দিনে সুনামগঞ্জ হইতে ষ্টিমারে ছাতক গেলাম। তথায় ভাগ্যক্রমে ২জন সঙ্গী পাইলাম ও পাহাড়ে নদীতে চলার উপযুক্ত একখানা বারকী নৌকা ঠিক করিয়া বেলা ৯টার সময় ৩ জনে ভোলাগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহাতে আমাদের ৫৲ পাচ টাকা ভাড়া লাগিল। এই নৌকা পাঁচখানা তক্তায় তৈয়ারী। ১৫।২০ হাত লম্বা এবং পাশে আড়াই হাত হইবে। আট দশ হাত লম্বা ১ খানা ছই আছে। তাহাতে অতি কষ্টে ৪ চারি জন মাত্র যাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক নৌকায় দুইজন করিয়া মাঝি থাকে। ১টি ১৩।১৪ বৎসরের বালক, অপরটি যুবক কিম্বা প্রৌঢ়। আমরা যে নৌকা ভাড়া করিলাম তাহার ১টি মাঝি অনুমানিক পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ়, অপরটি তাহার তের বৎসরের ছেলে। মাঝিটি বেশ রসিক, গাইতে পারে। সে আমাদিগকে সারাটা পথ গান শুনাইয়াছে। ছাতক হইতে নৌকা ছাড়িয়া কিছু দূর গিয়া প্রৌঢ় ছেলেটিকে বলিল "বাপজান এক ছিলিম তামাক খাওনা।" ছেলেটি তামাক সাজিয়া হুকাটি বাপের দিকে বাড়াইয়া দিল। প্রৌঢ় বৈঠা বাহিতে বাহিতে বলিয়া উঠিল—"আরে জেলে দেনা বাপু আমি কি আর টনে ধুমো বে'ড় কত্তে পারি?" বালক অমনই হুক্কা টানিতে টানিতে পরশু রামের দ্বিতীয় অবতারত্ব প্রমাণ করিল। আমরা কোনও মতে রাতটি কাটাইয়া অতি প্রত্যূষে ভোলাগঞ্জ ঘাটে পৌছিলাম। আমরা নিজেরই জিনিষপত্র টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলাম কিছুক্ষণের মধ্যে খাসিয়া মুটিয়ারা আসিয়া পৌছিল। এই সময় যদি আসিয়া উপস্থিত না হওয়া যায় তবে আর সেদিন মুটীয়া ধরা যায় না এবং মুস্মাই

মোটর কেশ করিতে হয়। কাজেই যাহাতে অতি ভোরে ভোলাগঞ্জ পৌছান যায় যাত্রীদের সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে সব মুটিয়া আসিয়া পৌছিল তাহাদের মধ্যে অৰ্দ্ধেক পুরুষ ও অৰ্দ্ধেক মেয়ে লোক। এই সব মুটিয়াদের মধ্যে কচিৎ ২।১ জন হিন্দি জানে মাত্র। বাংলা মোটেই জানে না। ভোলাগঞ্জের নিকটবর্ত্তী খাসিয়াদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ সিলেটি বাংলা জানে কিন্তু তাহারা মুটিয়াগিরি করে না। তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ব্যবসায়ী। কাজেই কুলিদের সহিত খাসিয়া ভাষাতেই কথাবার্ত্তা করিতে হয়। আমি উক্ত ভাষায় তখন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গতিকে সঙ্গীদের উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিলাম। আমার সঙ্গী দ্বয়ের মধ্যে ১ জনের বয়স ৪০।৪৫ বৎসর হইবে; অপরের বয়স কুড়ি একুশ। তাহাদের সহিত এর পূর্ব্বে আমার বরাবর পরিচয় না থাকিলেও তাহাদিগকে আমি চিনিতাম বয়স্ক ব্যক্তিটিকে আমাদের উভয়েরই একটু মানিয়া চলিতে হইত, তাই সর্ব্বদা তাহার নিকট হইতে একটু দূরে থাকিতে চাইতাম। আমার বয়স্ক সহযাত্রীটি ১টি খাসিয়াকে ডাকিতেছিলেন "উ—মামা আশে হাংনে ভাংনে মুট নি তল্লি।" আমি তখন তরুণ সঙ্গীটির সহিত একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ঐ কথা গুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার পুণরাবৃত্তি করিয়া আমাকে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। উহার অর্থ এই যে "ওহে এখানে এস। এখানে তিনটি মুটে আছে।" আমার অবোধগম্য আরও কত কিছু বলিয়া পাঁচসিকা করিয়া ৩টি মুটিয়া ঠিক করিলেন। তাহাদের মধ্যে ২টি ১৮।১৯ বৎসরের মেয়ে ২টি যে বোঝা লইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি আনুমানিক ২৫ হইতে ৩০ সেরের মধ্যে এবং পুরুষটির বোঝা ন্যুনাধিক ৩৫ সের হইবে। তাহারা এই রকম এবং এর চেয়ে বেশী বোঝা লইয়া ও ৭ মাইল খাড়া পাহাড় অনায়াসে অতিক্রম করে। এমন কি আরো পিঠে করিয়া অনেক ভুরিওয়ালা আদমিকে ভোলাগঞ্জ হইতে ৭ মাইল উপরে মুস্‌মাই পৌছাইয়া দেয়। ইহারা বড় বিশ্বাসী, বড় বিশ্বাটিকে বড়ই ঘৃণা করে। ইহারা মুট লইয়া ফারি রাস্তায় চলিয়া যায়। মালিকের সহিত কচিৎই দেখা হয়। কিন্তু মুস্‌মাই পৌছিয়া সমস্ত জিনিষপত্র ঠিক পাওয়া যায়। ইহারা যেমনই কঠোর পরিশ্রমী তেমনই আমোদপ্রিয়। গান বড় ভাল বাসে। যাত্রীদের মধ্যে যাহারা পাহাড়ে চড়িতে অক্ষম, তাহারা থাপায় চড়িয়া যায়। তাহাতে ৩৲ হইতে ৫৲ খরচ পড়ে ইহা কতকটা বেতের চেয়ারের মত; কিন্তু কোনও পা নাই বা একটি মাত্র পা আছে বলা যাইতে পারে। কারণ আসনের নীচটা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়া এক জায়গায় মিলিয়াছে ও তথায় একটি পা'র সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ থাবা বাশ ও বেতের সমষ্টি মাত্র। আরোহী যাহাতে পা ঝুলাইয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য দুইখণ্ড রশিদ্বারা একটি কাঠ কিম্বা বাশ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। আরোহী ঐ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পা ঝুলাইয়া রাখেন। খাসিয়া মুটিয়া তখন ঐ চেয়ারটিকে ১টি বেতের তৈয়ারী রশিদ্বারা আসনের নীচেই বেষ্টন করিয়া পিঠে নেয় ও তাহার কপালের সহিত রশিদ্বারা আটকাইয়া রাখে। নীচের দিক হইতে ক্রমশঃ উপরের দিকে বড় হইয়া আসিয়াছে বলিয়া পড়িয়া যায় না। তখন খাসিয়া চেয়ারটিকে পিঠে করিয়া উপরে উঠিতে থাকে ও আরোহী তাহার বাহনের উপর সমস্ত জীবনের ভার অর্পণ করিয়া নিম্নস্থ ভূভাগের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উপরে উঠিতে থাকেন। কাকা মহাশয় আমাকে থাবা করিয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার বয়স্ক সহযাত্রীটি মুটিয়া রওয়ানা করাইয়া দিয়াই সরোষে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। আমার সমবয়স্ক সঙ্গীটি বাজারে প্রবেশ করিয়া আমাদের পাথেয় বাবত ২ খানা পাউরুটি ও কয়েকখানা বিস্কুট লইয়া পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন ও আমাকে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আমার খাবা লাগিবে কিনা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। কি করি ইঙ্গিতে পরিচালিত পুতুলটির মত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। পাহাড় আর বেশী দূরে ছিল না তাই মিনিট বিশেকের মধ্যেই পাহাড়ে পৌছিলাম ও চড়িতে আরম্ভ করিলাম; আর মনে মনে মা পার্ব্বতীকে স্মরণ করিতেছিলাম। প্রথমে যে তিন মাইল পাহাড় চড়িলাম তাহা তত দুরারুহ নহে, কাজেই ক্রমশঃ আমার ভয় কমিয়া আসিতে লাগিল। পথে আরও অনেক সমবয়স্ক যাত্রী পাইলাম, ইহাও সাহসের অন্যতম কারণ। চড়িতে চড়িতে পাহাড়ের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম তাহাতে নয়ন মন যুগপৎ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। এখানে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে গেলে আমার মত লেখক কৃতকার্য্য হইবে না বরংপ্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। অতএব তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে পাহারের সৌন্দর্য্য একটু ভয়ঙ্কর। মনের মধ্যে পাশাপাশি আনন্দ ও ভয়ের সঞ্চার হয়। এই পথের পাশেই নীচে অনেক কমলা বাগান দেখিতে পাইলাম। রাস্তার ও দুই পাশে সারি দেওয়া কমলা কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছই অধিক। মধ্যে মধ্যে কফি গাছও দেখিতে পাওয়া যায়। পথিকগণ স্বচ্ছন্দে ঐ সকল গাছের ফল ভোগ করিতে পারেন। চারিদিকে সহস্র ঝিল্লিরব শুনিতে পাইলাম। চারিদিকের ছড়ার শব্দও পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত হইয়া আমাদের কাণে আসিয়া পৌছিতে ছিল। সেই পাষাণ ভেদী শব্দ শান্ত অথচ গম্ভীর আমরা যে পথে চলিতে ছিলাম তাহ ছায়া শীতল। ঘন বনানীর জন্য সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। মধ্যে মধ্যে পাতার ফাঁকে দিয়া যে কিরণ টুকু উঁকি মারিতেছিল—তাহা রাস্তায় পড়িয়া দূর হইতে গলিত হিরকখণ্ডের মত দেখিতেছিলাম। এই তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া বুড়ির বাজারের উঠনিতে * আসিয়া পৌছিলাম। ও কিছুদূর উঠিয়াই পিছনে তাকাইয়া মাতা বসুমতীকে সুজলা শ্যামলরূপে দেখিতে পাইলাম। যে ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইলাম তাহা ছাতককে কেন্দ্র করিয়া কিয়দ্দুর বিস্তৃত ভূভাগ। ইহা দেখিয়া আমার পর্ব্বত উপার হইতে নীলগিরি ও উদয় গিরির মধ্য বর্ত্তী ভূমিখণ্ডের দৃশ্যের বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া গল।

সেই সবুজ ভূখণ্ডের ভিতর দিয়া যে নদীগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাইতেছিল—আমার চক্ষে যেন সেগুলি সবুজ গালিচার উপর নীল তুলির টান বলিয়ামনে হইতে লাগিল। একটা পাথরের উপর বসিয়া আমরা দুইজনে এই দৃশ্য কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিতে ছিলাম। পরে উঠিয়া আবার পাহাড় ধরিতে লাগিলাম।

বাড়ীতে রাস্তার যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেকাংশ সত্য। এখন আমরা যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম তাহা বামদিকে দুইশত ফিট উচ্চ এবং ডানদিকে আড়াইশত ফিট নীচু হইবে। মধ্যখানে অনতি পরিসর একটি রাস্তা। একবার পা পিছলাইলে আর রক্ষা নাই। ভোলাগঞ্জ হইতে মুসমাইর রাস্তা আগা গোড়াই পাথরের তৈয়ারী। আশাম গভর্ণমেন্টের কৃপায় তাহার সামান্য উন্নতি

* যে সব রাস্তা অধিকতর খাড়া ও দুরারুহ তাহাকে উঠনি বলে।

হইয়াছে মাত্র। মনে মনে গিরিকুমারী পার্ব্বতীকে একটি গিরি কুমারী রূপেই আমার রক্ষা কর্ত্রী স্মরণ করিয়া এই অনতিপরিসর রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিলাম, এইরূপ অনেক রাস্তা অতিক্রম করিয়া শিবের টিলায় আসিয়া পৌঁছলাম। ভোলাগঞ্জ হইতে মুস্মাইয়ের রাস্তায় পথের পাশে অনেক চা'র দোকান আছে। তথায় গরম চা তৈয়ারী পাওয়া যায়। পরিশ্রান্ত পথিকগণ চা'পান করতঃ শ্রান্তিদূর করেন।

শিবের টিলায় পাথরের নির্ম্মিত একটি মন্দির আছে। তথায় মহাদেবের বিগ্রহ আছে। পূজারি আছে। নিত্য পূজাকরে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই মহাদেবকে প্রণাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দিয়া আসেন। আমরাও এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিলাম, এখন মুস্মাই পৌছিতে কেবল মাত্র দুই মাইল রাস্তা এই রাস্তার পাশে বড় বড় সরল বাগান দেখিতে পাইলাম। এই রাস্তা অন্য রাস্তা গুলির তুলনায় সমতল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই রাস্তায় পাশে পাশে অতি গভীর ও প্রশস্ত খাত পাওয়া যাইতে ছিল। ইহার অনেক গুলি রাস্তার পাশে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। এই গুলিকে খাসিয়া'রা কুরুঙ্গ বলে। মুস্মাই, শিলং হইতে চেরা মটর সার্ভিসের শেষ ষ্টেশন চেরা পার হইয়া সাত মাইল আসিলে মুস্মাই পাওয়া যায়। তথায় এক রকমের ১টি Resting house ও ১টি ডাক বাংলা আছে আমরা বেলা দুই প্রহর সময় মুস্মাই পৌছিয়া মটর লরি ও টেকসী প্রস্তুত পাইলাম। এখান হইতে সিলেটের অনেকটা যায়গা দেখিতে পাওয়া যায়। মুস্মাই যে জল প্রপাত আছে তাহা কোনও দিন ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু গত ১৩০৪ সনের ভূমি কম্পে তাহার অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখনও ইহা ১টি দেখিবার জিনিষ। বর্ষাকালে জলের বেগ বাড়িয়া ইহা আরও সুন্দর দেখায়। বেলা ১টার সময় আমাদের মটর ছাড়িল ও আধ ঘণ্টার মধ্যে ৯ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া চেরাপুঞ্জি পৌছিল। তথায় মিনিট ৫।৭ অপেক্ষা করিয়া আরও আরোহি জুটাইয়া লইল ও শিলং অভিমুখে রওয়ানা হইল কিছু দূর গিয়াই যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহতে মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল রাস্তার এক পাশে কুরুঙ্গ শ্রেণী ক্রমাগত চলিয়াছে; ন্যূনধিক চারিশত ফিট্ গভীর হইবে এবং প্রস্থেও তদ্রূপই হইবে। আমাদের মটর কুরঙ্গের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। একটু এদিক ও দিক হইলে ৪০০ ফিট নীচে পড়িতে হইবে। কুরুঙ্গের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত যে জায়গাটী ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে তাহার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ঐ জাগাতে সবুজ ছোট ছোট গাছগুলি মটর হইতে পাতলা সবুজ বর্ণের দুর্ব্বার মত দেখাইতেছিল। সমস্ত ঢালু জায়গা ঐ রকম সবুজ বর্ণে আবৃত ছিল। নীচে একটি ছড়া ঐ কুরুঙ্গের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ঝর ঝর শব্দে বহিয়া যাইতে ছিল। তাহর শব্দ অস্পষ্ট হইয় আমাদের কানে আসিয়া লাগিতেছিল এবং মটর হইতে ছড়াটিকে মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত সাদা রেখার মত দেখাইতেছিল। এই কুরুঙ্গের সবুজতার মধ্যে তুলার মত সাদা সাদা মেঘ গুলি ভাসিয়া ভাসিয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। ঐ জায়গার পাহাড়ের উপর কোনও গাছ গাছড়া নাই। অনেকের মুখে শুনিতে পাইলাম এই রকম কুরুঙ্গের দৃশ্য সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। ইহা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানীয়। আমরা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা যাবৎ ঐ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। তারপর তাহা আমাদের পেছনে পড়িয়া গেল। বেলা ৪টা সময় শিলং মটর ষ্টেশনে পৌছিলাম ও তথা হইতে এক খানা টেকসীতে করিয়া বাসায় পৌছিলাম

সমাপ্ত।

PRINTED BY

Surendra Nath Sen.

At the Sreenath, Press Nayabazar, Dacca.